রাজরাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়া।

মহারাণীর জীবন কথা।

(১৮১৯—১৮৯৭)

কলিকাতা

৩৪।১ কলুটোলা ষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী ষ্টীম-মেসিন-প্রেসে

শ্রীঅরুণোদয় রায় দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩০৪ সাল।

রাজরাজেশ্বরী

ভিক্টোরিয়া।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

একবার ইংলণ্ড ভাবো,—একবার ইংরেজকে ভাবো,—আর ভাবো, সেই লণ্ডন-নগর ;—পৃথিবীতে সেই দ্বিতীয় অমরাবতী—লণ্ডন-নগর।

এই লণ্ডন-নগরের অদূরে কেন্‌সিংটন নামক পল্লী অবস্থিত। এই গ্রামে একটী রাজবাটী আছে। রাজবাটী-সংলগ্ন উদ্যানের বৃক্ষনিচয় ফল-ফুলে সুশোভিত ;—গ্রীষ্মে এবং বসন্তে নানা জাতীয় মধুরকণ্ঠ বিহঙ্গমকুল দ্বারা নিনাদিত।

এই কেন্‌সিংটন-রাজভবনে, ইংলণ্ডেশ্বরের আদেশে, রাজবংশীয় এক দুঃখী দম্পতী বাস করিতেন। দম্পতীর অর্থের সচ্ছলতা আদৌ ছিল না। স্বামী ঋণ-জালে জড়িত ; রাজ ভাণ্ডার হইতে যে তনখা পাইতেন, তাহাতে রাজোচিত সম্মান রাখিয়া স্বচ্ছন্দে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইত না। স্বামী তনখা-বৃদ্ধির জন্য রাজার নিকট আবেদন করিলেও, তাহা গ্রাহ্য হইল না। অর্থ-কষ্টেই কাল কাটিতে লাগিল।

স্ত্রী রূপবতী, গুণবতী,—লক্ষ্মীরূপিণী ছিলেন। তাঁহার গৃহিণীপণাগুণে সংসার কষ্টের হইলেও, এক রকম সুখে চলিত। স্ত্রী, তনখার টাকা হইতে মাসে মাসে কিছু কিছু কর্জ্জের টাকা শোধ দিতেন। অবশিষ্ট টাকা বেশ গুছাইয়া, মিতব্যয়িতা দেখাইয়া, সংসার চালাইতেন। এই দম্পতীর বেশভূষার বাহার ছিল না, দাস-দাসীর সংখ্যা অতিরিক্ত ছিল না, আহারীয় সামগ্রীর

আড়ম্বর ছিল না। রাজপুত্র ও রাজপুত্রবধূ হইয়াও এই দম্পতী, সামান্য গৃহস্থের ন্যায় কাল অতিবাহিত করিতেন।

স্বামী হইলেন,—তাৎকালিক ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় জর্জ্জের চতুর্থ পুত্র। স্বামীর নাম এডওয়ার্ড,—ডিউক অব্ কেণ্ট। স্ত্রীর নাম মেরী লুইসা। জর্ম্মণীর অন্তর্গত সেক্সকোবার্গ-সাল-ফিল্ডের ডিউক-কন্যা। প্রিন্স লিউপোল্ডের ইনি ভগিনী। এই স্ত্রীর পুর্ব্বে একবার বিবাহ হইয়াছিল। স্বামীর নাম ছিল—এমিক চার্লস্। এই বিবাহের ফল,—একটী পুত্র ও একটী কন্যা। কালক্রমে প্রথম পতি-বিয়োগে ইনি বিধবা হইয়া, কিছুকাল অতিবাহিত করিলেন। পরে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডেশ্বরের চতুর্থ পুত্র এডওয়ার্ড ডিউক অব্ কেণ্টের সহিত তাঁহার শুভ-পরিণয় সংঘটিত হইল।

শুভ বিবাহের পর রাজপুত্র ও রাজপুত্রবধূ উভয়ে জর্ম্মণ দেশে বাস করিতে লাগিলেন। স্ত্রী,—জর্ম্মাণ-রমণী; স্বামী,—ইংরেজ- রাজপুত্র। সুতরাং জর্ম্মাণ দেশে বাস করিবার উদ্দেশ্য কি? জর্ম্মাণ রাজ্যে বাস করিলে, কম-খরচে সংসার চলে। দরিদ্র রাজপুত্র তাই জর্ম্মাণ রাজ্যে বাস করিতে স্থির করিয়াছিলেন। দেখিতে দেখিতে জর্ম্মণ-রাজপুত্রী গর্ভবতী হইলেন। কালে এই গর্ভস্থ সন্তান ইংলণ্ডের অধীশ্বর বা অধীশ্বরী হইতে পারে,—অনেক দূরদর্শী ব্যক্তি ইহা বুঝিতে পারিলেন। রাজপুত্র ডিউক অব্ কেণ্টকে তখন বন্ধুগণ উপদেশ দিলেন 'জর্ম্মণ রাজ্যে থাকা আপনার উচিত হয় না, আপনার পত্নীর এই গর্ভস্থ সন্তানের, ইংলণ্ডের ভূমিতে জন্ম হওয়া উচিত। ইংলণ্ডে জন্ম না হইলে, আপন সন্তান ইংলণ্ডের সিংহাসনে বসিতে পাইবে না। আপন সন্তানের রাজা বা রাজ্ঞী হওয়া খুব দুরাশা হইলেও, ভবিষ্যৎ ভাবিয়া কাজ করিতে হয়। অতএব আপনি সস্ত্রীক ইংলণ্ডে গমন করুন।'

ভ.'ী আশায় বুক বাঁধিয়া, স্বামী ও স্ত্রী ইংলণ্ডে আগমন করিলেন;—এবং কেন্‌সংটন রাজভবনে বাস করিবার আদেশ পাইলেন।।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

১৮১৯ খৃষ্টাব্দে ২৪শে মে, জ্যৈষ্ঠ মাসের অতি প্রত্যূষে অথবা রাত্রি থাকিতে থাকিতে, জর্ম্মণ-রাজপুত্রীর এক কন্যা হইল। কন্যা, রূপে কেন্‌সিংটন-রাজভবন আলোকিত করিল। জয়ধ্বনিতে চারিদিক্ পূর্ণ হইল। রাজমন্ত্রিগণ, রাজাদেশে সেই ভুবনমোহিনী কন্যার মূর্ত্তি দেখিতে আসিলেন। ঠিক এক মাস পরে ২৪শে জুন কন্যাকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করা হইল। কন্যার খুড়া-জেঠাগণ, মাতুলগণ, মাতুলানীগণ এবং আরও অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ কন্যার এই দীক্ষাকালে উপস্থিত ছিলেন। কন্যার পিতার ইচ্ছা ছিল,—কন্যার নাম হউক এলিজেবেথ; কিন্তু কন্যার জেঠামহাশয় নাম দিলেন—এলেকৃজেন্ড্রিনা। কন্যার পিতা বলিলেন,—"তবে ঐ সঙ্গে আরও একটী নাম যুক্ত করা হউক।" জেঠামহশয় বলিলেন—"তবে এলেকৃজিন্ড্রিনার পর 'ভিক্টোরিয়া' এই নাম যুক্ত হউক।" রাজকন্যার নাম হইল,—

'এলেকৃজেন্ড্রিনা ভিক্টোরিয়া।'

জন্মকালে জনসাধারণ ভাবে নাই,—অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিও স্থির করিতে পারেন নাই যে, এই কন্যা কালে ইংলণ্ডের অধীশ্বরী হইবেন। কন্যা ভাগ্য-বতী। ক্রমশঃ এরূপ অভাবনীয় ঘটনা-সমূহ ঘটিতে লাগিল যে, কন্যা ক্রমশই সিংহাসনের নিকটবর্ত্তিনী হইতে লাগিলেন। সমস্তই বিধাতার লীলা!

১৮১৯ খৃষ্টাব্দে, সংসারের একমাত্র অবলম্বন—কন্যাটীকে লইয়া, স্বাস্থ্যের উন্নতির নিমিত্ত, সমুদ্রের অদূরবর্ত্তী সিড্‌মাউথ গ্রামে গিয়া উক্ত দম্পতী বাস করিলেন। একটী বালক বন্দুক লইয়া রাজভবনের নিকটে চড়ুই পাখী শিকার করিতেছিল। বন্দুকের গুলি চড়ুই পাখীকে লাগিল না,—যে ঘরে রাজকন্যা ছিলেন, সেই ঘরের সারসী ভাঙ্গিয়া, গুলি রাজকন্যার দিকে ছুটিল। রাজকন্যা তখন ধাত্রীর কোলে ছিলেন। ভয়বিহ্বলা ধাত্রী চীৎকার করিয়া উঠিল।

ভিক্টোরিয়ার যখন চারি বৎসর বয়স, তখন ইংলণ্ডের রাজা চতুর্থ জর্জ্জ—সর্ব্বাঙ্গে হীরক-খচিত, ভিক্টোরিয়ার একটী অনুরূপ-মূর্ত্তি ভিক্টোরিয়াকে উপহার দিলেন। বালিকা সজীব ভিক্টোরিয়া,—আর একটী হীরকমণ্ডিত নির্জ্জীব ভিক্টোরিয়া পাইলেন। বালিকা আপন প্রতিমূর্ত্তিকে কত আদর করিতেন,—কত বার কোলে করিতেন, কতবার কাঁধে করিতেন। কখন বা উভয়ে রাগারাগি হইত। রাগের পর আবার ভিক্টোরিয়া তাহাকে ভাল বাসিতেন; আবার তাহার মুখচুম্বন করিতেন।

ভিক্টোরিয়ার যখন পাঁচ বৎসর বয়স, তখন তাঁহার সুশিক্ষার নিমিত্ত, ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্ট হইতে বার্ষিক ছয় হাজার পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় এক লক্ষ টাকা মঞ্জুর হইল। সুবিখ্যাত পাদরি ডাক্তার জর্জ্জ ডেভিস্ ভিক্টোরিয়ার শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। ব্যারোনেস্ লেজেন শিক্ষয়িত্রী হইলেন। মাতার বিশেষ আদেশ-অনুসারে খৃষ্টধর্ম্মের সার গ্রন্থ—বাইবেলের কিছু কিছু অংশ ভিক্টো-রিয়াকে প্রত্যহ পড়ানো হইত। শিক্ষক এবং শিক্ষয়িত্রীর ছয় বৎসরকাল যত্ন ও পরিশ্রমে, ভিক্টোরিয়া ফ্রেঞ্চ এবং জর্ম্মণ ভাষায় উত্তমরূপে কথা কহিতে শিখিলেন, ইটালী ভাষায় তাঁহার জ্ঞান জন্মিল। লাটীন ও গ্রীক ভাষাও ভিক্টো-রিয়া কিছু কিছু শিখিলেন। ভার্জ্জিল ইলিয়ড তিনি আবৃত্তি করিতে পারিতেন। অঙ্কশাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি জন্মিল। ভিক্টোরিয়ার বুদ্ধি বড় তীক্ষ্ণ ছিল। রাজকুমারী নাচ শিখিলেন, গান শিখিলেন, বাজনা শিখিলেন। এইরূপে তাঁহার বয়স একাদশ বর্ষ পূর্ণ হইল।

ফুল ডালা লইয়া বালিকা ভিক্টোরিয়া

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ভিক্টোরিয়া শিশুকাল হইতে ফুল ভালবাসিতেন; আর ভাল বাসিতেন—কুকুর। বাগানের ফুল গাছের তলা, ফোড় বা ছোট কোদালী লইয়া আপনি খুঁড়িতেন। পাত্র পূর্ণ করিয়া, দৌড়িয়া জল আনিয়া, আপনি গাছে দিতেন। কখন বা কাঁচি লইয়া গাছের কেয়ারী করিতেন। কখন বা গাছে উঠিয়া ঝুলিতেন; ফুল লইয়া খেলিতেন; পল্লব ছিঁড়িতেন; শাখা ভাঙ্গিতেন।

কুকুর কিন্তু ভিক্টোরিয়ার বড় প্রিয় পাত্র ছিল। তিনি আপন কুকুরের গলা জড়াইয়া ধরিতেন; কুকুরের গায়ে ঠেশ দিয়া বসিতেন; কত আদর করিতেন;—আহারের সময় কুকুরকে না দিয়া খাইতেন না। কখন বা ভিক্টোরিয়া কুকুরের উপর চড়িয়া বসিতেন। অবাধ্য হইলে কুকুরকে মারিতেন। কখন বা ছোট কুকুরকে ছেলে বলিয়া কোলে লইতেন।

কহিলেন, "চাবি বন্ধ, কাটী তোমার হাতে,—আমি কেমন করিয়া পিয়ানো বাজাইব?" রাজনন্দিনী উত্তর দিলেন, "তবেই বুঝিয়া দেখ, পিয়ানো আমার সহজে দখলে আসিল কি না?" শিক্ষয়িত্রী পরাস্ত হইলেন; হাসিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বাল্যকালে ভিক্টোরিয়া তিনবার প্রাণসঙ্কট বিপদে পড়িয়াছিলেন। প্রথম বিপদের কথা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। বালক, পাখী শিকার করিতে গিয়াছিল; গুলি ভিক্টোরিয়ার কপালের নিকট দিয়া যায়, কিন্তু লাগে নাই। চতুর্থ বৎসরে দ্বিতীয় বিপদ ঘটে। ভিক্টোরিয়া ঘোড়-গাড়ী করিয়া যাইতেছেন; পথে ঘোড়া ক্ষেপিল। উর্দ্ধশ্বাসে ঘোড়া দৌড়িল। 'হায়' 'হায়' শব্দ উঠিল; কেননা, গাড়ীর ভিতর ভিক্টোরিয়া! আর রক্ষা নাই, নিশ্চয়ই প্রাণ যাইবে। বলিতে বলিতে গাড়ী উণ্টাইয়া গেল। যাহারা দেখিতে পায় নাই, তাহারা ভাবিল, গাড়ী-চাপনে ভিক্টোরিয়া পেষিত হইয়াছেন। কিন্তু যাহারা দেখিয়াছিল, তাহারা দেখিল, ঠিক্ গাড়ী যখন উণ্টাইতেছে, তখন একজন বীরপুরুষ ভিক্টোরিয়ার বসন ধরিয়া টানিয়া ভিক্টোরিয়াকে গাড়ী হইতে লুফিয়া লইল। গাড়ী ভূতলে পড়িল; ভিক্টোরিয়া সৈনিক-পুরুষের দেহে আসিয়া আশ্রয় লইলেন।

ভিক্টোরিয়া-জননী তখন দীন দরিদ্রা, অর্থকষ্টকাতরা; সেই বীর সৈনিক পুরুষকে তিনি তৎক্ষণাৎ এক গিনি পারিতোষিক দান করেন; পরে আরও পাঁচ পাউণ্ড উপহার পাঠাইয়া দেন।

ইহার অল্প দিন পরে ভিক্টোরিয়া জননীর সহিত সমুদ্র-মধ্যবর্ত্তী বাতি-ঘর দেখিতে গিয়াছিলেন। হঠাৎ ঝড় আসিয়া নৌকার মাস্তুল ভাঙ্গিল। ভিক্টোরিয়া নৌকার বহির্দ্দেশেই বাসিয়াছিলেন। মাঝি অমনি দৌড়িয়া

বাগানে কুকুরের সঙ্গে খেলা।

গিয়া ভিক্টোরিয়াকে কোলে করিয়া তুলিয়া ধরিল; যে স্থানে ভিক্টোরিয়া বসিয়াছিলেন, ঠিক সেইখানে মাস্তুলের কাটখানি গিয়া পড়িল! মাঝি যদি ভিক্টোরিয়াকে তুলিতে আর এক মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব করিত, তাহা হইলে ভিক্টোরিয়া তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্ব পাইতেন।

ভিক্টোরিয়াকে ভবিষ্যৎ-জীবনে আরও এইরূপ প্রাণসঙ্কট বিপদ-জালে পড়িতে হইয়াছিল। কিন্তু যিনি রাজ-রাজেশ্বরী হইয়া সসাগরা পৃথিবী

পালন করিবেন, ভগবান্ তাঁহাকে সতত রক্ষা করিয়া থাকেন। কোন বিপদই তাঁহার নিকট বিপদ নয়।

বাল্যকালে ভিক্টোরিয়া মাতার সহিত ইংলণ্ডের নানা স্থানে ভ্রমণ করেন। এইরূপ ভ্রমণে তাহার বিশেষ বহুদর্শিতা জন্মে। ভিক্টোরিয়ার যখন দশ বৎসর বয়স, তখন পর্ত্তগলের ত্রয়োদশ-বয়স্কা রাণী, ইংলণ্ডে আগমন করেন। মহা-সমারোহে রাজ-দরবার বসে। ইংলণ্ডের যাবতীয় প্রধান লোক, সেই দরবারে উপস্থিত হন। ইংলণ্ডের অধীশ্বর কর্তৃক অর্থাৎ ভিক্টোরিয়ার জেঠা মহাশয় কর্তৃক আহূত হইয়া, ভিক্টোরিয়া সেই রাজ-দরবার সন্দর্শন করেন। ইতিপূর্ব্বে জননী ভিক্টোরিয়াকে কখন রাজ-দরবারে আসিতে দেন নাই; এমন কি, রাজবাটীতেও কখন আসিতে দেন নাই। রাজ-দরবার,—রাজবাটী অতি কুস্থান বলিয়া, তখন সাধারণের নিকট পরিচিত ছিল। রাজবাটীতে যাতায়াত করিয়া, পাছে ভিক্টোরিয়া বিলাসিনী হন,—আড়ম্বর-প্রিয় হন,—লোভ-লালসার অধীন হন,—এই ভয়ে, মাতা এ পর্য্যন্ত ভিক্টোরিয়াকে রাজ-দরবারে উপস্থিত হইতে দেন নাই। কিন্তু আজ রাজা-দেশ,—আজ জ্যেষ্ঠতাতের আদেশ,—কাজেই ভিক্টোরিয়াকে মাতার সহিত দরবারে যাইতে হইল। পর্ত্তুগালের রাণী দোনামেরিয়ার নিকট ভিক্টোরিয়া আসিয়া বসিলেন। উভয়েই বালিকা; উভয়েই হাত-ধরাধরি করিয়া, কখন কাণে কাণে,—কখন হাসিয়া হাসিয়া কথা কহিতে লাগিলেন। সকলে অনিমেষ-নয়নে উভয়কে দেখিতে লাগিলেন। কেহ বলিল, দোনামেরিয়া সুন্দরী; কেহ বলিল, ভিক্টোরিয়া সুন্দরী। শেষে সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে স্থিরীকৃত হইল, ভিক্টোরিয়ার ন্যায় লজ্জাশীলা বালিকা ইংলণ্ডে আর নাই,—সমগ্র ইউরোপেও বুঝি আর পাওয়া যায় না। পর্ত্তুগালের রাণীর সহিত ভিক্টোরিয়ার বল্-নাচ হইল। দুই জন পুরুষ এবং ঐ দুইটী বালিকা,—এই চারিজনে একত্রে বল-নাচ হইল। সর্ব্বচক্ষু তখন এক হইয়া, এই চারি জনের নৃত্য দেখিতে লাগিল। ভিক্টোরিয়া ভাল নাচিতেছেন, কি,

দোনামেরিয়া ভাল নাচিতেছেন,—এই কথা লইয়া বিষম বিতর্ক উপস্থিত হইল। কেহ বলিল, "ঐ দেখুন, দোনামেরিয়ার নাচ ভাল," কেহ বলিলেন, "না, না, তা নয়,—নাচে ভিক্টোরিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠা। দোনামেরিয়া রূপবতী হইতে পারেন, উঁহার বেশ-ভূষা উৎকৃষ্ট হইতে পারে, কিন্তু নাচে নিশ্চয়ই তিনি ভিক্টোরিয়ার নিকৃষ্টা।"

নাচ ভাঙ্গিল। ভিক্টোরিয়া পর্ত্তুগালের রাণীর সহিত কোলাকুলি করিলেন; বিদায় লইলেন। দূরদর্শী দর্শকমণ্ডলী পরস্পর টেপাটেপি করিলেন, "এই ভিক্টোরিয়াই হয় ত এক দিন ইংলণ্ডের অধীশ্বরী হইবেন।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

রাজনন্দিনী ভিক্টোরিয়া দিনে দিনে শশিকলার ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। তাঁহার নীল নয়ন নীলকমলের শোভা-ধারণ করিল। সেই লজ্জাভাব-মাখা টুকটুকে মুখখানি একবার যে দেখিত, সে আবার দেখিতে চাহিত। বেশ-ভূষার আড়ম্বর ছিল না। বুদ্ধিমতী জননী, কন্যাকে বিচিত্র রঙের বসন-ভূষণে সজ্জিত করিয়া, পরী সাজাইয়া, কখন রাজপথে বাহির করেন নাই। কিন্তু সাদা-পোষাকেই ভিক্টোরিয়াকে অধিক সুন্দরী দেখাইত। জনীর উদ্দেশ্য বিফল হইত; লোকে সাদা ধপধপে মল্লিকামালা-রাশির ন্যায় প্রস্ফুটিত ভিক্টোরিয়াকে দেখিতে অধিক ভালবাসিত; এবং আপনা-আপনি ধীরে ধীরে বলাবলি করিত, "এই নব মল্লিকার মালাই আমাদের রাণী হইবেন।"

দেখিতে দেখিতে ভিক্টোরিয়ার বয়ঃক্রম বার বৎসর পূর্ণ হইল। শিক্ষক ডেভিস এবং শিক্ষয়িত্রী লেজেন যার-পর-নাই পরিশ্রম করিয়া রাজকুমারীকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। সে শিক্ষা সর্ব্ববিষয়িণী ছিল। নাচ-গান-বাদ্য শিক্ষা, অশ্বারোহণ ও ধনুর্বিদ্যাদি শিক্ষা, কথা কহিবার,—পত্র লি

প্রণালী শিক্ষা,ধর্ম্ম-গ্রন্থ বাইবেল শিক্ষা,—আদব-কায়দা শিক্ষা;—ইহা ব্যতীত ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য, দর্শন, অঙ্কবিদ্যা,—সর্ব্ববিষয়িণী শিক্ষা, ভিক্টোরিয়াকে প্রদত্ত হইতে লাগিল। নিঃসন্তান ইংলণ্ডেশ্বর ভিক্টোরিয়াকে ভাবী ইংলণ্ডেশ্বরী জানিয়া, তাঁহার শিক্ষা সম্বন্ধে, সর্ব্বদা সংবাদ লইতে আরম্ভ করিলেন। হাব-ভাব-বিলাসের বশবর্ত্তিনী না হইয়া, সুশীলা রাজবালা, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী এবং জননীর উপদেশানুসারে কাল কাটাইতে লাগিলেন। জননীর প্রকৃতি তেজস্বিনী অথচ মধুরা ছিল। তিনি স্বয়ং স্বভাবসুন্দরী এবং সৎ-স্বভাবান্বিতা। সংসার-সাগর-তরঙ্গে অনেকবার হাবুডুবু খাইয়া তিনি অভিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। কাজেই কন্যাকে কিরূপে মানুষ করিতে হয়, তাহা তিনি জানিতেন। কোন্ বিষয়, কোন্ কথা, কোন্ ব্যাপার কন্যা-কালের কুপ্রবৃত্তির উত্তেজক, তাহা তিনি বুঝিতেন। কন্যাকালে কোন্ পথ কুপথ, কোন পথ সুপথ, কোন্ পথ কণ্টকময়, কোন্ পথ মধুময়,—এ জ্ঞানও জননীর বিলক্ষণ ছিল। তাই তিনি তদীয়া নয়নতারা অন্ধের যষ্টি-স্বরূপা এক মাত্র কন্যাকে সর্ব্বদা যেন আপন বাহুযুগলের দ্বারা বেষ্টনপূর্ব্বক রক্ষা করিয়াছিলেন। জননীর এই তত্ত্বাবধানই, ভিক্টোরিয়ার ভাবী জীবন, অকলঙ্ক চন্দ্রের ন্যায়, ইউরোপীয় গগনপটে শোভা পাইয়াছিল।

দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রম কালে ভিক্টোরিয়ার জীবনে এক অভিনব ঘটনা ঘটে। রাণী হইবার পথে যত বাধাবিপদ ছিল, সমস্তই প্রায় দূর হইল। দেখিতে দেখিতে রাজসিংহাসন আরো নিকটবর্ত্তী হইল। এই বালিকার ভবিষ্যতে ইংলণ্ডের রাণী হইবার সম্ভাবনা আছে, এ কথা এত দিন, বুদ্ধিমতী জননী আপন কন্যাকে বলেন নাই, এবং অন্য কাহাকেও বলিতে দেন নাই। 'ইংলণ্ডের রাণী হইব',—এই কথা শুনিয়া, পাছে বালিকার মাথা ঘুরিয়া যায়,—পাছে বালিকা অহঙ্কারময়ী হইয়া উঠে,—পাছে বালিকা সৎশিক্ষায় এবং পরিশ্রমলব্ধ কার্য্যে, মনোযোগ না দেয়, এই ভয়েই জননী, কন্যাকে রাণী হইবার কথা, এতদিন বলিতে সাহস করেন নাই।

ভিক্টোরিয়ার মাতা।

এক দিন শিক্ষয়িত্রী লেজেন ভিক্টোরিয়ার মাতাকে বলিলেন,—"দেখুন,—আর বিলম্ব করা উচিত নয়,—ভিক্টোরিয়া আর নিতান্ত শিশু নাই,—এখন সে জীবনচরিত পড়ে, ইতিহাস পড়ে, সংবাদপত্র দেখে, মহাসভার সংবাদ লয়,—সন্তান ত আর শিশু নাই ;—ভিক্টোরিয়া যে, কালে ইংলণ্ডের রাণী হইবেন, সে কথা আমাদের এই সময়ে বলিয়া দেওয়া উচিত।"

জননী স্থিরচিত্তে ভাবিয়া কহিলেন,—"তাহাই হউক।"

লেজেন বলিলেন,—"স্পষ্টত বলা হইবে না,—কৌশলে বলিতে হইবে।"

যে ইতিহাস-গ্রন্থ, রাজকুমারী পড়েন, সেই ইতিহাস-গ্রন্থের মধ্যে, শ্রীমতী লেজেন, ইংলণ্ডের রাজবংশাবলী-লিখিত এক খণ্ড কাগজ রাখিয়া দিলেন

পাঠের নির্দ্দিষ্ট সময় আসিল ; শিক্ষক ডেভিস্ আগতপ্রায়। ভিক্টোরিয়া গৃহান্তর হইতে পাঠগৃহে আসিয়া পঁহুছিলেন। শ্রীমতী লেজেন ভিক্টোরিয়ার পার্শ্বেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। পুস্তক খুলিয়া, তন্মধ্যে এক নূতন কাগজ-খণ্ড দেখিয়া, রাজকুমারী কহিলেন,—"এ কাগজ এখানে কে রাখিল ? এ কাগজ ত আমি আর কখন দেখি নাই।"

শ্রীমতী লেজেন কহিলেন,—"এত দিন এ কাগজ খানি দেখা, আপনার তত দরকার হয় নাই। এখন সময় হইয়াছে, দিন নিকটে আসিয়াছে, তাই দেখিতে পাইলেন।"

রাজবালা সেই কাগজখানি লইয়া একাগ্রচিত্তে, অনিমেষ নয়নে পড়িতে লাগিলেন। পড়িয়া গম্ভীর-ভাবে কহিলেন,—"একি! আমি ইংলণ্ডের রাজ সিংহাসনের অতি নিকটে আসিয়াছি,—ইহা কি ঠিক ? ইহাই কি প্রকৃত-কথা ?"

শ্রীমতী লেজেন উত্তর দিলেন,—"রাজনন্দিনি! উহাই ঠিক,—উহাই প্রকৃত কথা।"

রাজবালা আর কথা কহিতে পারিলেন না; নীরবে অবনত মুখে কি ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিয়া কহিলেন,—"অনেক বালক বালিকা, রাজা বা রাণী হইব শুনিলে গরবে ফুলিয়া উঠে, ইহাতে গরব করিতে নাই। রাজ-সিংহাসনে বসিলে দায়িত্ব বড় কঠিন। সিংহাসনের শোভা এবং চাক্‌চিক্য খুব বেশী আছে বটে ; কিন্তু দায়িত্ব তদপেক্ষা অনেক বেশী।"

বাষ্পগদ্গদকণ্ঠে রাজনন্দিনী ভিক্টোরিয়া এই কথা বলিতে বলিতে শিক্ষয়িত্রী লেজেনের হাত ধরিলেন। ধরিয়া গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "তবে আমি আরও ভাল হইতে চেষ্টা করিব। আজ আমি বুঝিতে পারিয়াছি, তুমি আমাকে সুশিক্ষা দিবার জন্যে,—এমন কি, লাটীন ভাষা শিক্ষার জন্যে, কেন এত পীড়া-পীড়ি করিতে, কেন এত ধমক দিতে। অগষ্টা এবং মেরী কখন লাটীন শিক্ষা করে নাই। কিন্তু তুমি আমাকে বলিতে যে, লাটীন ইংরেজী ব্যাকরণের

।ভিক্টোরিয়ার পিতা।

বানয়াদস্বরূপ এবং লাটীন ভাষাই সুন্দর সুন্দর পদাবলীর খনিস্বরূপ। তোমার আদেশ অনুসারে, অতি যত্ন সহকারে এতদিন আমি লাটীন পড়িতেছিলাম; কিন্তু আজ বুঝিলাম, কেন তুমি আমাকে লাটীন ভাষা শিখিবার জন্যে, এত উপদেশ দিতে!"

রাজবালা লেজনের হাত ধরিয়া রহিলেন; আবেগপূর্ণহৃদয়ে পুনরায় বলিলেন,—

"তবে আমি আরও ভাল হইব।"

শ্রীমতী লেজেন কহিলেন,—"এখনও এত বেশী আশা করিওনা। ইংলণ্ডেশ্বরের পত্নী এডিলেডের এখনও বয়স বেশী হয় নাই। এখনও তাঁহার সন্তান

জন্মিতে পারে। তাহা হইলে, বর্ত্তমান মহারাজের মৃত্যুতে, সেই সন্তানই ইংলণ্ডের রাজা বা রাণী হইতে পারে।"

রাজকন্যা উত্তর দিলেন,—"যদি তাহা হয়, তাহা হইলেই বা আমার দুঃখ কি? কারণ আমি জানি, রাজমহিষী আমার জেঠাই মা,—এডিলেড আমাকে বড়ই ভাল বাসেন। আমি জানি যে, তিনি একটী শিশুসন্তান কোলে পাইলে বড়ই সুখিনী হইবেন।"

এই ঘটনার, পরদিন হইতে ভিক্টোরিয়া, পাঠাভ্যাসে এবং আপন কর্ত্তব্য কর্ম্মে আরও মনোযোগিনী হইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

রাজনন্দিনীর বয়ঃক্রম সতের বৎসর হইল। প্রচলিত প্রথা অনুসারে, ধর্ম্মযাজক আসিয়া, এই সময়ে রাজকুমারীকে আবার খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। মহা সমারোহে এ কার্য্য সম্পন্ন হইল। ইংলণ্ডের রাজা, ইংলণ্ডের প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গ সে সভায় উপস্থিত হইলেন। লোকে লোকারণ্য। ভিক্টোরিয়া সকলেরই লক্ষ্যভূত। ধর্ম্মযাজক, ভিক্টোরিয়াকে উপদেশ দিতে লাগিলেন—"দেখো বৎসে! তুমি ইলণ্ডের ভাবী অধীশ্বরী! সিংহাসনে বসিয়া বুঝিয়া সুঝিয়া, সকল কাজ কর্ম্ম করিও। রাজসিংহাসন সুখময় নহে, সুখে দুখে অমৃতে গরলে মিশ্রিত। স্বর্গধামে দেবতা আছেন, মনে রাখিও। সংসারের মায়ার জালে পড়িও না। যখন সঙ্কটে পড়িবে, তখন মা,—যিনি রাজার রাজা,—যিনি সসগরা পৃথিবীর অধীশ্বরেরও অধীশ্বর, সেই ভগবানের উপর আত্মনির্ভর করিয়া, সেই ভগবানের পদপ্রান্তে চাহিয়া, বিপদজাল ছেদন করিতে চেষ্টা করিবে।"

এই কথা শুনিতে শুনিতে, ভিক্টোরিয়ার নয়নযুগলে জলধারা দেখা দিল। হৃদয়ের আবেগ তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না,—শিশুর ন্যায় হাউ হাউ

ষোড়শী ভিক্টোরিয়া।

করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মাতার স্কন্ধদেশে পতিত হইয়া মুখ লুকাইলেন, এবং কাঁদিতে কাঁদিতে হাঁফাইতে লাগিলেন। জননী, বাহুদ্বয় দ্বারা কন্যাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক বেষ্টন করিয়া রহিলেন; তাঁহারও চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। ইংলণ্ডেশ্বরও চোখের জল রাখিতে পারিলেন না। তিনিও কাঁদিতে কাঁদিতে ভিক্টোরিয়ার মাথায় হাত দিয়া বলিতে লাগিলেন,—"মা চুপ কর; মা,—কান্না কিসের?"

ইংলণ্ডীয় যাবতীয় সমবেত নরনারী চক্ষু দিয়া সেদিন বারিধারা নির্গত হইয়াছিল। সকলকেই রুমাল লইয়া চোখের জল মুছিতে হইয়াছিল। ঐতিহাসিকগণ বলেন,—"এরূপ অপরূপ দৃশ্য, ইংলণ্ডে আর কেহ দেখেন নাই। এইরূপ অপরূপ ঘটনা ইংলণ্ডে আর কখন ঘটে নাই।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ভিক্টোরিয়ার জননী ডচেস্-অব্-কেণ্ট, কন্যাকে নানা বিদ্যায় নিপুণা করিলেন,—এমন কি, কাঁথা-সেলায়ের কাজটী পর্য্যন্ত শিখাইলেন। জননী কন্যাকে সদাই বলিতেন,—"মা, আমি তোমাকে বড় দুঃখ পাইয়া মানুষ করিয়াছি; তুমি দুঃখিনীর সন্তান,—অল্প দিন পরেই রাজরাজেশ্বরী হইবে। তুমি রাণী হইলে, লোকে যেন বলিতে না পায়, এই দুঃখীর মেয়েটীর তেমন শিক্ষাদীক্ষা হয় নাই,—কাজেই উত্তমরূপ রাজকার্য্য করিতে পারিতেছে না।' তুমি রাণী হইয়া, এমন ভাবে কার্য্য করিবে যে তদ্দ্বারা তোমার উচ্চপদের গৌরব সমুচিত রক্ষা হইবে। এখন যদি আমার শিক্ষাবশে, তুমি সৎস্বভাবান্বিতা এবং উত্তমা স্ত্রী হও, তাহা হইলে, ভবিষ্যতে তুমি অবশ্যই সৎস্বভাবান্বিতা এবং উত্তমা রাণী হইবে। ভিক্টোরিয়া! তুমি এই দুঃখিনী মায়ের কথা স্মরণ রাখিয়া কার্য্য করিও।"

জর্ম্মণীতে ভিক্টোরিয়ার মাতুল প্রিন্স লিওপোল্ড বাস করিতেন। পিতৃহীন হইবার পর হইতেই, কন্যা ভিক্টোরিয়া, মাতুলের বিশেষ প্রিয়পাত্রী হইলেন। সময়ে সময়ে মাতুল ইংলণ্ডে আসিয়া, ভিক্টোরিয়াকে দেখিতেন, আদর করিতেন, উপহার সামগ্রী দিতেন এবং শিক্ষা-কার্য্যের বিশেষরূপ তত্ত্বাবধান করিতেন। কারণ, মাতুল বুঝিয়াছিলেন, এই ভিক্টোরিয়াই কালে, ইংরেজ জাতির সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হইবেন। তিনিও উপদেশ দিতেন,—"মা, তোমার উপর গুরুতর দায়িত্ব উপস্থিত হইবার কাল আসিতেছে। লেখা পড়া ভাল

করিয়া শিখিও, মা! কাহার সহিত কিরূপ ভাবে ব্যবহার করিতে হয়, তাহা জানিয়া রাখিও, মা! কখন কোন কাজ অধীরা বা উতলা হইয়া করিও না। অন্তরে রাগ হইলে, তাহা দমন করিয়া, সহজ ভাবে কার্য্য করিবে। যখন তুমি সিংহাসনে বসিবে, তখন বহুব্যক্তি তোমাকে বহুরূপ উপদেশ দিবে; উপদেশ সকল মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণে করিবে; কিন্তু কোন্ বিষয়টী ভাল, কোন্ বিষয়টী মন্দ,—ইহা স্বয়ং বিচার করিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিবে। নিতান্ত শিশু-কন্যার ন্যায় কাহারও কথায় উঠিও না, কাহারও কথায় বসিও না। সকল কার্য্যেই নিজের একটু অস্তিত্ব রাখিয়া, তাহা সুসম্পন্ন করিতে সচেষ্ট হইবে।"

সপ্তদশবর্ষীয়া বুদ্ধিমতী ভিক্টোরিয়া মাতুলকে বলিতেন,—"আপনার আদেশ শিরোধার্য্য। যত দূর সাধ্য, ইহজীবনে তত দূর আপনার আদেশ প্রতিপালন করিতে যত্নবতী হইব।"

মাতুল লিওপোল্ড উচ্চবংশোদ্ভব এবং কুটুম্বিতাসূত্রে উচ্চ বংশের সহিত সম্মিলিত। তিনি রাজনীতিজ্ঞ, বুদ্ধিমান্ এবং চতুরচূড়ামণি। তিনি আলাপে আপ্যায়িতে—জন-মনোমোহন, গল্প করিতে বিলক্ষণ পারদর্শী। ইংলণ্ডের তদানীন্তন রাজপুত্র প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের কন্যা শ্রীমতী সারলটকে, মাতুল-লিওপোল্ড বিবাহ করেন। ইংলণ্ডেশ্বর জর্জ্জের প্রথম পুত্র উক্ত প্রিন্স-অব-ওয়েল্‌সের অল্প দিন মধ্যে মৃত্যু ঘটিল। তখন তাঁহার কন্যা শ্রীমতী সারলট, পিতামহ তৃতীয় জর্জ্জের মৃত্যুর পর, ইংলণ্ডের অধীশ্বরী হইবেন, অনেকে ইহা আশা করেন। মাতুল লিওপোল্ড, শ্রীমতী সারলটের স্বামীরূপে ইংলণ্ডভূমি শাসন করিবেন, এই আশায় বুক বাঁধিলেন। কিন্তু কালের কুটিলা গতি! শ্রীমতী সারলট যৌবনে আপন দেহত্যাগ করিলেন। মাতুল লিওপোল্ড, স্ত্রী-বিয়োগে, নানা কারণে, মর্ম্মে ব্যথা পাইলেন। সারলটের স্বামীরূপে ইংলণ্ড-শাসন করিবার আশা ভরসা তাঁহার ফুরাইল!

প্রিন্স লিওপোল্ড তখন ভাবিতে লাগিলেন, তাঁহার বংশের কোন সুসন্তান

যদি ভিক্টোরিয়াকে বিবাহ করিতে পারেন, তাহা হইলেও তাঁহার মনের দুঃখ কতকটা দূর হয়। তাঁহার ভ্রাতা ডিউক অব কোবর্গের দুই পুত্র ছিল। প্রথম পুত্রের নাম—আর্ণেষ্ট; দ্বিতীয় পুত্রটীর নাম—আলবার্ট। আলবার্টের ন্যায় রূপবান্ পুরুষ, তৎকালে ইউরোপে ছিল না বলিলে, অত্যুক্তি হয় না। সেই পদ্মপলাশলোচন দুটীর দিকে যে একবার চাহিয়া দেখিয়াছে, সে সহজে আর চোখ ফিরাইতে পারে নাই! সেই হাসি-হাসি মুখখানি যে একবার দেখিয়াছে, সে সেই মুখ আর কখন ভুলিতে পারে নাই। আলবার্টের মধুর কণ্ঠে কূজন-ধ্বনি একবার যে শুনিয়াছে,—বুঝি, বীণাধ্বনিও তাহার নিকট আর ভাল লাগে নাই। আলবার্টের কেশকলাপের বাহার এক বার যে দেখিয়াছে,—চুলের অন্যরূপ বাহার, আর তাহার কখন মনোমত হয় নাই। এই আলবার্ট হইতেই এদেশে আলবার্ট ফ্যাসনের টেড়ী প্রচলিত। আলবার্ট,—মানুষ নয়, মূর্ত্তিমান্ কন্দর্প। প্রিন্স-লিওপোল্ড এই আলবার্টের সহিত, এই মূর্ত্তিমান্ মন্মথের সহিত, প্রণয়সূত্রে ভিক্টোরিয়াকে আবদ্ধ করিবেন, মনে মনে ইহাই দৃঢ় সঙ্কল্প করিলেন। তাঁহার শিক্ষা-গুরু—ব্যরণ ষ্টক্‌মার ভিন্ন, তিনি একথা কাহাকেও ফুটিয়া বলিলেন না।

এ দিকে ভিক্টোরিয়া কিছু কাল পরেই, ইংলণ্ডেশ্বরী হইবেন,—এই কথা নানা দেশে নানা নগরে প্রচারিত হইল। তখন ইউরোপের বহু রাজপুত্র, ভিক্টোরিয়ার পাণিগ্রহণ-অভিলাষী হইলেন। ইংলণ্ডের তদানীন্তন রাজা উইলিয়মের নিকট অনেক সহি-সুপারিস আসিতে লাগিল। রাজা উইলিয়ম,—নেদারল্যাণ্ডের প্রিন্স আলেকজান্দারকে, ভিক্টোরিয়ার বর ঠিক করিলেন। কখন বা প্রুসিয়ার প্রিন্স-আডেলবার্ট, ভিক্টোরিয়ার স্বামীরূপে নির্দ্ধারিত হইতে লাগিলেন। কেহ বা বলিলেন, "উরতেমর্গের ডিউক-আরণেষ্ট ভিক্টোরিয়ার ভর্ত্তা হইলে ভাল হয়।" ইহা ব্যতীত আরও অনেক রাজপুত্রের নাম ভিক্টোরিয়ার ভাবী-স্বামী-শ্রেণী মধ্যে গণনা করা হইল। কিন্তু আলবার্টের নাম, কৈ, কাহারও মুখে শুনা গেল না!

প্রিন্স-লিওপোল্ড একদা আপন ভগিনী, অর্থাৎ ভিক্টোরিয়ার মাতার নিকট আপন মনোগত অভিপ্রায় জানাইলেন। ভিক্টোরিয়ার মাতা, প্রিন্স-আলবার্টের রূপের ও গুণের পক্ষপাতী ছিলেন। ভ্রাতার প্রস্তাব ভগিনী অনুমোদন করিলেন,—"জর্ম্মণ দেশ হইতে তোমার ভ্রাতা ডিউক-অব-কোবার্গ এবং তদীয় পুত্রদ্বয় আর্ণেষ্ট এবং আলবার্টকে নিমন্ত্রণ করিয়া তোমার কেন্‌সিংটন রাজভবনে লইয়া আইস; এবং এক মাস কাল উঁহাদিগকে রাজবাটীতে রাখ ও আমোদ-আহ্লাদ কর। কিন্তু ভিক্টোরিয়ার সহিত আলবার্টের যে বিবাহ-সম্বন্ধ হইবে, একথা কাহাকেও বলিও না এবং ভিক্টোরিয়া কিংবা আলবার্টকেও ইহা জানাইও না। এখন প্রকাশ করিলে বিশেষ ক্ষতি আছে। বর এবং কন্যা উভয়ের যখন মনের মিল হইবে, প্রীতি ভালবাসা জন্মিবে, এবং উভয়েই উভয়কে বিবাহ করিতে সমুৎসুক হইবে, তখনই বিবাহের প্রস্তাব করা কর্ত্তব্য; এখন ঘুণাক্ষরে কেহ যেন টের না পায়।"

জর্ম্মণদেশস্থ দাদাকে সপরিবারে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য, ভিক্টোরিয়ার জননী ইংলণ্ডরাজের নিকট অনুমতি চাহিলেন। এই নিমন্ত্রণের কথা শুনিয়া রাজা অতিশয় বিরক্ত হইলেন এবং নিমন্ত্রণের পক্ষে নানারূপ বিঘ্ন-বাধা উপস্থিত করিলেন। বুদ্ধিমতী ভিক্টোরিয়ার জননী, নানা কৌশলে বহু বিঘ্নবাধা অতিক্রম করিয়া নিমন্ত্রণসম্বন্ধে, ইংলণ্ডেশ্বরের অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন।

মে মাস। ইংলণ্ডে তখন বসন্ত কাল। কেন্‌সিংটন-বাগানে নানারূপ ফুল ফুটিয়াছে। কোন ফুল কেবল শোভার জন্য,—কোন ফুল সৌরভ দিবার জন্য, কোন ফুল শোভা এবং সৌরভ উভয়ের জন্য। রাজনন্দিনী ভিক্টোরিয়া কোন প্রিয়তম ফুলগাছে জল সেচন করিতেছেন; কোন ফুলগাছের গোড়াটী মাটী দিয়া বাঁধিয়া দিতেছেন! ফুটন্ত ফুলগুলিকে তুলিয়া, ভিক্টোরিয়া কখন মালা গাঁথিতেছেন, কখন তোড়া তৈয়ারী করিতেছেন,—রাজবালা ফুলমালা লইয়া মাতাকে উপহার দিতেছেন। ফুল-খেলা সাঙ্গ হইলে, কখন গান গাহিতেছেন, কখন পিয়ানো বাজাইতেছেন, কখন বা শিক্ষয়িত্রীর নিকট

এলবার্ট এবং ভিক্টোরিয়া।

নাচ শিখিতেছেন! আর নির্দ্দিষ্ট-কালে শিক্ষকের নিকট সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞানপাঠে মনোনিবেশ করিতেছেন। সপ্তদশবর্ষীয়া বালিকা ভিক্টোরিয়া ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের মে মাসে, সুখ-বসন্তে এইরূপেই কাল কাটাইতেছেন।

ভিক্টোরিয়ার মাতার নিমন্ত্রণ-গ্রহণ করিয়া, ডিউক অব কোবার্গ পুত্রদ্বয় সহ এমনই দিনে ইংলণ্ডে কেন্‌সিংটন-রাজভবনে, ভিক্টোরিয়ার মাতার নিকট উপস্থিত হইলেন। প্রিন্স আলবার্ট,—ডিউক অব কোবার্গের কনিষ্ঠ পুত্র। ভিক্টোরিয়া অপেক্ষা বয়সে তিন মাস ছোট। বয়সে তিন মাসের ছোট হই-লেও, প্রিন্স আলবার্টকে ভিক্টোরিয়া অপেক্ষা, ছোট দেখাইত না, বরং বেশী বয়সই দেখাইত। প্রিন্স-আলবার্টের নবযৌবনের সেই আরম্ভ; রাজনন্দিনী ভিক্টোরিয়ারও নবযৌবনের সেই আরম্ভ। কুসুমকলিকা প্রস্ফুটিত হইবার সূচনা যেন দেখা দিয়াছে। ভিক্টোরিয়া, প্রিন্স-আলবার্টকে নয়ন ভরিয়া দেখিতে লাগিলেন,—আর মনের দ্বারা সেই রূপসুধা পান করিতে লাগিলেন। ভিক্টোরিয়া বুঝিলেন, ইনি মর্ত্তের মানব নহেন, ইনি বুঝি স্বর্গের দেবতা! ইঁহার সর্ব্বাঙ্গে যেন পবিত্রতা ভাব মাখা। যঁহার এমন রূপমাধুরী,— তিনি অবশ্যই সর্ব্বগুণের আধার হইবেন! এইরূপ 'ভাবিতে ভাবিতে ভিক্টোরিয়া ও তাঁহার মাতা, আগন্তুক কুটুম্ববর্গকে সমাদর এবং সসম্মানে কেন্‌সিংটন-রাজভবনে বাসা দিলেন। আমোদ-আহ্লাদ, গান-বাজনা, ভ্রমণ-পাদচারণ, শকটারোহণ, একত্র আহার, একত্র পাঠ, সমস্তই মহাস্ফূর্ত্তির সহিত চলিতে লাগিল। কখন ভিক্টোরিয়া ফুল তুলিয়া মালা গাঁথিয়া আল-বার্টের হাতে দেন! কখন আলবার্ট ফুল তুলিয়া মালা গাঁথিয়া ভিক্টোরিয়ার হাতে দেন।

আলবার্টের চক্ষে ভিক্টোরিয়া পৃথিবীমধ্যে অদ্বিতীয়া সুন্দরী বলিয়া পরি-গণিতা হইলেন! আলবার্টের ভিক্টোরিয়ার কথা যেমন মিষ্ট-মধুর বোধ হইতে লাগল, তেমন মিষ্ট-মধুর কথা পৃথিবী মধ্যে আর কোথাও তিনি শুনিতে পাইলেন না। আলবার্টের নয়নে ভিক্টোরিয়ার হাসি,—সে তো কৌমুদী-

রাশি !! আলবার্টও দেখিলেন, ভিক্টোরিয়া মানবী নহেন! বিধাতা বুঝি, বিরলে বসিয়া এই দেবীমূর্ত্তি সৃষ্টি করিয়াছেন।

পরমানন্দে এইরূপেই প্রায় এক মাস কাল অতিবাহিত হইল। বিদায়-কালে সেই যুবতীজন-মনোরঞ্জন, কামদেবতুল্য রূপলাবণ্যসম্পন্ন প্রিন্স-আলবার্ট, ভিক্টোরিয়ার সেই শ্বেতপদ্মবিনিন্দিত সুকোমল অঙ্গুলি মধ্য, একটী হীরক-খচিত অঙ্গুরীয় পরাইয়া দিয়া, বিদায় লইলেন। বিদায়কালে উভয়ের নয়নোপান্তে অশ্রু-জল দেখা দিয়াছিল কি না, উভয়ে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়াছিলেন কিনা, তাহা বুঝি কেহ দেখে নাই।—তাই ইতিহাসেও একথা কিছু লিখিত হয় নাই।

এই প্রিন্স আলবার্টই ভিক্টোরিয়ার ভাবী স্বামী; এবং এই ভিক্টোরিয়াই প্রিন্স-আলবার্টের ভাবী সহধর্ম্মিণী। অন্য সম্পর্কে প্রিন্স আলবার্ট, ভিক্টো-রিয়ার মামাতো ভাই; এবং কুমারী ভিক্টোরিয়া, প্রিন্স-আলবার্টের পিসতুত ভগিনী। আমাদের দেশে এরূপ ভ্রাতাভগিনীতে বিবাহ নিষিদ্ধ হইলেও, বিলাতে—খৃষ্টান দেশে এরূপ ভ্রাতাভগিনীর বিবাহ মহা-সমারোহে সুপ্রচলিত।

চতুরচূড়ামণি মাতুলের উদ্দেশ্য সফল হইল। তিনি চার-চক্ষু দ্বারা বুঝি-লেন, পরস্পারের প্রতি পরস্পারের প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মিয়াছে। সে পবিত্র স্বর্গীয় ভালবাসা পরস্পারের হৃদয় হইতে কিছুতেই দূর হইবার নহে! তখন মাতুল লিওপোল্ড ভাগিনেয়ী ভিক্টোরিয়াকে এক পত্র লিখিয়া জানাইলেন, প্রিন্স আলবার্টকে বিবাহ করা সম্বন্ধে তোমার অভিপ্রায় কি? বুদ্ধিমতী সপ্তদশ-বর্ষীয়া ভিক্টোরিয়া কৌশলে এইরূপ উত্তর দিলেন!—

"প্রিয়তম মাতুল মহাশয়! আপনার নিকট আমার এক্ষণে একমাত্র প্রার্থনা এই, আমার প্রিয়তম আলবার্টের যাহাতে স্বাস্থ্য ভাল থাকে, সে বিষয়ে আপনি সতত যত্ন করিবেন। কেবল আপনার বিশেষ তত্ত্বাবধানে তাঁহাকে রক্ষা করিবেন।"

লিখন-ভঙ্গিতে মাতুল বুঝিলেন, ভিক্টোরিয়া আলবার্টের প্রতি মনপ্রাণ সঁপিয়াছেন!

ভিক্টোরিয়ার প্রথম মন্ত্রিসভা।

নবম পরিচ্ছেদ।

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে ২৪শে মে, রাজনন্দনী ভিক্টোরিয়ার আঠার বৎসর পূর্ণ হইল। নাবালিকা ভিক্টোরিয়া, সাবালিকা হইলেন। ইংলণ্ডের লণ্ডন নগরে মহা সমারোহ ব্যাপার আরম্ভ হইল। ভাবী ইংলণ্ডেশ্বরীকে প্রজাবর্গ অভিনন্দনপত্র ও উপহার সামগ্রী দিতে লাগলেন। স্বয়ং রজো আপন ভ্রাতুষ্পুত্রী ভিক্টোরিয়াকে স্নেহভরে রাশি রাশি উপহার প্রদান করিলেন এবং দুই শত গিনি মূল্যের পিয়ানো নামক একটী বাদ্যযন্ত্র ভিক্টোরিয়াকে দান করিয়া কহিলেন,—মা তুমি পিয়ানো বাজাইতে ভাল শিখিয়াছ। এই পিয়ানোট

বাজাইও।" ভিক্টোরিয়া-পরিবারের সাংসারিক ব্যয়নির্ব্বাহ জন্য রাজা, সেই দিন হইতে আরও লক্ষাধিক টাকা নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন; ভিক্টোরিয়ার এই বয়ঃপ্রাপ্তি উপলক্ষে ইংলণ্ডের বহু-সওদাগর আফিস ও যাবতীয় রাজকার্য্যালয় এক দিবস বন্ধ হইল। রাজবাটীতে এই উপলক্ষে ভিক্টোরিয়ার সেই দিন নিমন্ত্রণ হইল। আহারান্তে ভিক্টোরিয়ার সম্মানার্থে নাচ হইল। এই দিন রাজসভায় ভিক্টোরিয়া, মাতা অপেক্ষা উচ্চ আসনে বসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। মাতা নিম্নাসনে, কন্যা উচ্চাসনে,—দেখিয়া, ভিক্টোরিয়া ভাবিতে লাগিলেন, রাজ-দরবারে এমন বিসদৃশ-দৃশ্য কেন দৃষ্টি করিতে হয়! স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী আমার পদপ্রান্তে বসিবেন!—এদৃশ্য তো আমার সহ্য হইবে না!

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে ২৯শে মে ইংলণ্ডেশ্বরের জন্মতিথি-উপলক্ষে এক মহা রাজদরবার হয়। এই দরবারে ভিক্টোরিয়ার আগমন-কালে আনন্দ-সূচক এক মহাকরতালি ধ্বনি হয়; প্রজাবর্গ উচ্চকণ্ঠে চীৎকার করিয়া উঠিলেন,— "ঐ আমাদের ভাবী-রাণী আসিতেছেন! ঐ আমাদের ভাবী-রাণী আসিতে-ছেন! জয় ভবিষ্যৎ রাণীর জয়! জয় ভবিষ্যৎ রাণীর জয়।"

দেখিতে দেখিতে ইংলণ্ডেশ্বর চতুর্থ উইলিয়মের পীড়াবৃদ্ধি হইতে লাগিল। ক্রমশঃ তিনি এত দুর্ব্বল হইলেন যে, তাঁহার চলচ্ছক্তি রহিত হইয়া পড়িল। ভিক্টোরিয়া এই রুগ্ন রাজা,—আপন জ্যেষ্ঠতাতকে প্রত্যহ দেখিতে যাইতেন। সঙ্গে করিয়া ফুলমালা ও ফুলের তোড়া ভিক্টোরিয়া লইয়া গিয়া, জেঠামহাশয়ের শয্যাপার্শ্বে রাখিয়া দিতেন। রাজা ভিক্টোরাকে স্নেহ করিতেন;—কখন কখন ভিক্টোরিয়ার হাত ধরিয়া বলিতেন,—"মা আমার, এই বিশাল রাজ্য তোমাকে দিয়া গেলাম; তুমি ভগবানের নাম করিয়া প্রজাপালন করিও। ভগবান্ ভিন্ন কেহই আর রক্ষক নাই।" রাজমহিষী এডিলেডও এই ভিক্টো-রিয়াকে আপন কন্যার ন্যায় দেখিতেন। বলিতেন,—"আমার সন্তান নাই, তুমিই আমার সন্তান; তুমি রাণী হইলেই আমার পরম সুখ। মা! আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তুমি জন্মে জন্মে রাণী হইয়া এইরূপ প্রজা পালন কর!"

দেখিতে দেখিতে চতুর্থ উইলিয়মের রোগ আরও কঠিন হইয়া উঠিল। চিকিৎসকগণ তখনও মহারাজের প্রাণপণে চিকিৎসা করিতেছেন; কিন্তু মনে মনে বুঝিয়াছেন যে, রাজা আর বাঁচিবেন না; রাজার মৃত্যুশয্যায় এই শেষ শয়ন!

দশম পরিচ্ছেদ।

১৮ই জুন শনিবার (১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে) ইংলণ্ডের রাজা চতুর্থ উইলিয়মের পীড়া এত দূর বৃদ্ধি হইল যে, জনসাধারণ জানিল, রাজার মৃত্যু নিকট। উত্থানশক্তি-রহিত হইল; তথাপি রাজা রাজকার্য্য করিতে নিবৃত্ত হইলেন না। মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইয়াও তিনি আপন নাম, কাগজ-পত্রাদিতে স্বাক্ষর করিতে আরম্ভ করিলেন। সেইদিন তিনি একজন অপরাধীকে ক্ষমা করিয়া খালাস দিলেন। ১৫শে জুন প্রাতে রাজা, রাণীকে কহিলেন, "আমি আর একটী দিন মাত্র রাজ্য-শাসন করিব। আমার অন্তিকাল আসিয়াছে।" রাণীর চক্ষে জল আসিল। রাণীর সহচরীবৃন্দের চক্ষে জল আসিল। রাজা তাঁহার ক্ষীণ-হস্ত সঞ্চালন পূর্ব্বক কহিলেন, "ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন,—ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন।" ধর্ম্মযাজক আসিয়া রাজাকে ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেল পড়িয়া শুনাইতে লাগিলেন। সে দিবস রাজা কখন জাগিয়া থাকেন; কখন নিদ্রিত হন, কখন তন্দ্রা যান; কখন বা ঘুমের ঘোরে বলিয়া উঠেন,—"হা ভগবন্! তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই হইবে!" ক্রমে সন্ধ্যা আসিল; রাজা অচেতন হইলেন। ক্ষণমধ্যে আবার একটু চেতন হইল। আবার ঘুমের ঘোর আসিল। রাজা ঘুম-ঘোরে ধর্ম্মযাজককে কহিলেন, "বিশ্বাস করিও,—আমি একজন ধার্ম্মিক ছিলাম।" রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইল। রাজার কণ্ঠশ্বাস আরম্ভ হইল। রাত্রি যখন দুইটা বাজিয়া দশমিনিট,—আত্মীয়-স্বজন-পরিবেষ্টিত

হইয়া, বৃদ্ধ ইংলণ্ডেশ্বর আপন প্রাণবায়ু পরিত্যাগ করিলেন। সুস্বরে হায় হায় শব্দ উঠিল। রাজরাণী ও পরিবারবর্গ ধূলায় লুণ্ঠিত হইতে লাগিল।

লণ্ডন নগরের চারি দিকে ধ্বনি উঠিল,—রাজার মৃত্যু হইয়াছে,—রাজা আর নাই!—রাজা আর নাই! সত্তর বৎসরের বৃদ্ধ রাজার পরিবর্ত্তে আজ অষ্টাদশ-বর্ষীয়া কুমারী বালিকা সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন! সেই গভীর নিশাকালেই লণ্ডন নগরে ভয়ানক আন্দোলন উপস্থিত হইল। রাজবাটী-অভিমুখে দলে দলে লোক ছুটিতে লাগিল। গির্জ্জাসমূহে ভয়ঙ্কর রবে রাজার মৃত্যুসূচক ঘণ্টাধ্বনি হইতে লাগিল। প্রজাপুঞ্জের প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল।

তখন রাজ-পুরোহিত, ডাক্তার হাউএল এবং অন্য এক জন রাজবাটীর প্রধান কর্ম্মচারী—লর্ড চেম্বার্লেন,—ভিক্টোরিয়াকে এই সংবাদ জানাইবার জন্য, মৃত-রাজার শয্যাপার্শ্ব হইতে উত্থিত হইলেন। রাজমন্ত্রিবর্গ পরামর্শ দিলেন যে, ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া, দ্রুতগতি কেনসিংটন-রাজভবনে যাইয়া, ভিক্টোরিয়াকে এখনি এ সংবাদ দেওয়া উচিত। এবং সংবাদপ্রাপ্তি মাত্রই ভিক্টোরিয়া যে ইংলণ্ডের অধীশ্বরী হইলেন, ইহাও বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। কারণ, ইংলণ্ডের সিংহাসন রাজাশূন্য থাকিতে পারে না। ঐ দুই জন ব্যক্তি, রাত্রি আড়াইটার সময় লণ্ডন নগরের অদূরস্থিত কেন্‌সিংটন-রাজভবনে শকটা-রোহণে যাত্রা করিলেন। বেগে অশ্বচতুষ্টয় ছুটিল। শকটচক্রের ঘর্ঘর শব্দে রাজপথ প্রতিধ্বনিত হইয়া, প্রকম্পিত হইতে লাগিল। লোকে হঠাৎ জাগরিত হইয়া ঘুমঘোরে এক বিভীষিকা দেখিল!

পাঁচটা বাজিল। রাজকর্ম্মচারীদ্বয় ভিক্টোরিয়া-ভবনে উপস্থিত হইলেন। প্রভাত পাঁচ ঘটিকার সময় বিলাতে রাত্রি থাকে। তাঁহারা আসিয়া দেখিলেন, ভিক্টোরিয়ার রাজভবন নীরব, নিস্পন্দ। সকলেই ঘোর নিদ্রায় অভিভূত। দ্বারের দৌবারিকও নিদ্রিত। তাঁহারা রাজপ্রাসাদের ফটকে ঠেলা দিলেন, ধাক্কা মারিলেন, ঘণ্টা বাজাইলেন;—তথাচ কেহ রাজভবনের দ্বার খুলিল না। যখন তাঁহারা অনবরত বিষম ধাক্কা মারিতে ও অনবরত ঘণ্টা বাজাইতে লাগি-

লেন, তখন দ্বারী জাগিয়া উঠিল এবং দ্বার খুলিয়া দিল। রাজ-ভবনের বহিঃ-প্রদেশের উঠানে আসিয়া, তাঁহারা খানিকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলেন, আর এদিক-ওদিক চাহিতে লাগিলেন; তথাচ কেহ তাঁহাদিগকে ডাকিল না। উঠানে এইরূপ অপেক্ষা করিতেছেন, এমন সময়ে একটী লোক আসিয়া তাঁহাদিগকে রাজভবনের নিম্নতলস্থ একটী কুঠারীতে বসাইয়া রাখিলেন; এবং সে ব্যক্তি 'আসি' বলিয়া চলিয়া গেল। রাজকর্ম্মচারিদ্বয় সেই ঘরেই বসিয়া রহিলেন তাঁহাদিগকে কেহ আর ডাকিল না। তাঁহাদিগের তথ্য লইতে কেহ আর আসল না। তাঁহারা ভাবিলেন, তাঁহাদিগকে বোধ হয়, সকলে ভুলিয়া গিয়াছেন। আবার তাঁহারা ঘণ্টাধ্বনি জোরে আরম্ভ করিলেন, আবার তাঁহারা উচ্চ চীৎকার আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা উচ্চকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন,—'তাঁহারা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন। বিশেষ আবশ্যক আছে। বিশেষ রাজকার্য্য আছে।" অথাচ কেহ সাড়া দিল না। আবার কিছুক্ষণ তাঁহারা নীরব হইয়া বসিয়া রহিলেন। যখন সাড়ে পাঁচ ঘটিকা অতীত হইয়াছে, তখন আবার তাঁহারা জোরে ঘণ্টাধ্বনি আরম্ভ করিলেন। তখন একজন পরিচায়ক রাজভবন হইতে আসিয়া কহিলেন, "আপনারা এমন করিতেছেন কেন?" ধর্ম্মযাজক রাজপুরোহিত উত্তর দিলেন, "আমরা রাণী ভিক্টোরিয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি।" পরিচারক উত্তর দিল;—"সেকি কথা! এ ঘোর রাত্রিকালে রাজনন্দিনী সুখনিদ্রা যাইতেছেন; তাঁহার সুনিদ্রা এ সময়ে কে ভাঙ্গাইবে, বলুন! কার এমন সাহস?" ধর্ম্মযাজক পুরোহিত উত্তর করিলেন;—'ডচেস-অব্-কেণ্টের কন্যা বলিকা ভিক্টোরিয়া আর নাই,—তিনি মহারাণী ভিক্টোরিয়া হইয়াছেন;—আমরা সেই মহারাণীর সহিত রাজকার্য্যের কথা লইয়া, দেখা করিতে আসিয়াছি। রাজকার্য্য-সম্পন্নের নিমিত্ত তাঁহার নিদ্রাকে এখন দূরে রাখিতে হইবে। তাঁহাকে সংবাদ দিন,—সত্বরে সংবাদ দিন যে, ইংলণ্ডের মহারাণীর সহিত ক্যানটারবেরি এবং চেম্বার্লেন, রাজকার্য্য উপলক্ষে, দেখা করিতে

আসিয়াছেন।" অনুগত ভৃত্য, তাড়াতাড়ি গিয়া ভিক্টোরিয়াকে উঠাইল। সংবাদ পাইবামাত্র আলুথালু বেশে, আলুথালু কেশে ভিক্টোরিয়া রাজপুরোহিতের নিকট উপস্থিত হইলেন। ভিক্টোরিয়ার পায়ে চটি জুতা, গায়ে ঢিলে জামা—কাঁধে একখানি শালের রুমাল; চোখে জল, আর মুখে গম্ভীরভাব! রাজপুরোহিত ক্যানটারবেরি এবং রাজকর্ম্মচারী চেম্বারলেন এই উভয়েই, ভিক্টোরিয়াকে সম্মুখে দেখিয়া, নতজানু হইয়া, উপবিষ্ট হইলেন এবং যোড়হাতে কহিলেন, "মা! তুমিই ইংলণ্ডের রাণী হইয়াছ। অদ্য রাত্রি দুইটা বার মিনিটের পর আপনার জ্যেষ্ঠতাত চতুর্থ উইলিয়ম ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন;—সেই সময় হইতে আপনি ইংলণ্ডের অধীশ্বরী।"

ভিক্টোরিয়ার জননী আসিয়া ভিক্টোরিয়ার পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। কন্যা, হৃদয়ের আবেগ সহ্য করিতে না পারিয়া, মায়ের স্কন্ধে ভর দিয়া দাঁড়াইলেন। ধর্ম্মযাজক আবার কহিলেন, "ইংলণ্ডের রাণীর জয় হউক!" ভিক্টোরিয়া কহিলেন, "পুরোহিত মহাশয়! আমার কল্যাণকামনা করিয়া, ভগবানের নিকট প্রার্থনা করুন, আমি যেন ভগবানের কৃপায় এই দুস্তর রাজনীতি-সাগর পার হইতে পারি।"

একাদশ পরিচ্ছেদ।

অষ্টাদশবর্ষীয়া বালিকা ভিক্টোরিয়া, ভগবানের নাম লইয়া, আপন রাজত্ব আরম্ভ করিলেন। ভগবানের নামে যে কার্য্য সূচিত হয়, তাহার অমঙ্গল কোথায়? প্রভাত হইল। লণ্ডন নগরের যাবতীয় প্রধান প্রধান ব্যক্তি কেনসিংটন-রাজভবনে আসিতে লাগিলেন। রাণী ভিক্টোরিয়ার সর্ব্বপ্রথম কার্য্য হইল—মৃত রাজা চতুর্থ উইলিয়মের শোকসন্তপ্তা বিধবা সহধর্ম্মিণীকে একখানি পত্র লেখা। পত্র লিখিয়া শিরোনামা লিখিলেন,—'মহারাণী এডিলেড।' এক জন সহচরী ভিক্টোরিয়াকে তাঁহার ভুল দেখাইয়া কহিলেন, "তাঁহা[illegible] রাণী"

বলিয়া আর সম্বোধন করিবেন না,—'ভূতপূর্ব্ব মহারাণী'—এখন এইরূপ পাঠ-লেখাই কর্ত্তব্য।" ভিক্টোরিয়া ধীর গম্ভীরস্বরে উত্তর দিলেন,—"আমার পিতৃব্য-পত্নীকে কি বলিয়া যে এখন সম্বোধন করিতে হয়, তাহা আমি বেশ জানি; কিন্তু আমি সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাকে সে কথা স্মরণ করাইয়া দিব না। আমি সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার স্বামীর মৃত্যুর কথা তাঁহার বৈধব্যের কথা, কোন্ প্রাণে তাঁহার হৃদয়ে জাগাইয়া দিব?"

বেলা নয়টার সময় ইংলণ্ডের প্রধান রাজমন্ত্রী লর্ড মেল্‌বোরন্ ভিক্টোরিয়াকে দেখিতে আসিলেন। ইংলণ্ডের রাণীর সমক্ষে, রাজমন্ত্রী নতজানু হইয়া, যুক্তকরে উপবিষ্ট হইলেন। রাণী অভিবাদনপূর্ব্বক তাঁহাকে নির্দ্দিষ্ট আসনে উঠাইয়া বসাইলেন। মন্ত্রী মেল্‌বোরন্ কিরূপে যে রাজকার্য্য—পরিচালন করিতে হয়, সে সময় যথাসম্ভব ভিক্টোরিয়াকে সে বিষয়ে উপদেশ দিলেন। মেল্‌বোরন্, মহারাণীকে বলিলেন,—"অদ্যই কেন্‌সিংটন-রাজভবনে আপনার প্রিভিকাউন্সিলের প্রথম সভা আহূত হইবে। আপনাকে সে সভায় উপস্থিত হইতে হইবে; এবং বক্তৃতা পাঠ করিতে হইবে।"

সভা বসিবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই অদ্যকার কার্য্যপ্রণালী মেল্‌বোরন্ তাঁহাকে সবিশেষ বুঝাইয়া দিলেন। সভায় রাজ্যের যাবতীয় প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। মহারাণী চির-আয়ুষ্মতী হউন, এই ধ্বনিতে সভাগৃহ প্রতিধ্বনিত হইল। নূতন রাজত্বের আরম্ভ বিজ্ঞাপিত হইল। বিজয় ব্যাণ্ড বাজিয়া উঠিল। কেন্‌সিংটন রাজভবন প্রস্ফুটিত পদ্মমালার ন্যায় পরিলক্ষিত হইল।

দুঃখিনীর সন্ততি ভিক্টোরিয়া, আজ রাজরাজেশ্বরী হইলেন!

ভিক্টোরিয়া স্বভাবতঃ লজ্জাশীলা। "লোকারণ্য দেখিয়া ভীত হইও না; লজ্জিত হইও না। দিশাহারা হইও না"—এই কথা তাঁহার মাতা ভিক্টোরিয়াকে ভূয়োভূয়ঃ বুঝাইয়াছিলেন। কিন্তু আজ প্রথম দিন, প্রথম দরবার, প্রথম রাণী,—ভাব দেখি, ভিক্টোরিয়ার হৃদয় কিরূপ বিচলিত হইয়াছিল! যে

খুড়া-জেঠাকে ভিক্টোরিয়া প্রণাম করিতেন, সেই খুড়া-জেঠা আজ ভিক্টোরিয়ার নিম্নাসনে অবস্থিত! যে সকল স্ত্রীলোককে ভিক্টোরিয়া আপন জননীর সমান দেখিতেন, সে সকল স্ত্রীলোক আজ ভিক্টোরিয়ার নিম্নাসনে অবস্থিত। যে সকল বৃদ্ধমন্ত্রিবর্গকে ভিক্টোরিয়া গুরুস্থানীয় বলিয়া মনে করিতেন, সেই সকল মহাপণ্ডিত, রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তিগণ, যেন কত কৃপাপ্রার্থী হইয়া, ভিক্টোরিয়ার পদপ্রান্তে যোড়হস্তে দণ্ডায়মান!—ভাব দেখি, বালিকা ভিক্টোরিয়ার মনে কি ভাব হইতেছে! কোমলকলিকাসদৃশী লজ্জাশীলা বালিকা, এই দৃশ্য দেখিয়া যে মরমে মরিয়া যান নাই,—ইহাই যথেষ্ট। মাতার শিক্ষার গুণে, হৃদয়বেগ অনেকটা চাপিতে, ভিক্টোরিয়া সক্ষম হইয়াছিলেন। এক এক বার তাঁহার বুক ধড়াস ধড়াস করে,—আর অমনি ভিক্টোরিয়া মনে করেন—'মায়ের নিষেধ আছে, আমি ভীত হইব কেন?' ভিক্টোরিয়া কাহারও মু র দিকে না তাকাইয়া, অবনতবদনে সভাগৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক, রাজসিংহ উপবেশন করিলেন। প্রথম, রাজমন্ত্রী মেল্‌বোরন-লিখিত বক্তৃতাটী অতি সুললিত সুস্পষ্ট স্বরে পাঠ করিলেন। তাঁহার বীণানিন্দিত সেই কণ্ঠস্বরে, তাঁ র ইংরেজীর উচ্চারণশক্তির ভাব-ভঙ্গিতে—নিন্দুকদলও মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিয়াছিলেন! ভিক্টোরিয়ার বক্তৃতার সারমর্ম্ম এইরূপ—

"আমার জেঠামহাশয় চতুর্থ উইলিয়মের আমি সন্তান তুল্য। তাঁহার পরলোক-গমনে আমি শোকবিহ্বলা। জেঠামহাশয়ের স্নেহ আমি কখন ভুলিতে পারিব না। তাঁহার মৃত্যুতে ইংলণ্ডের অতি গুরুতর ক্ষতি হইয়াছে; এবং আমার উপর এই বিশাল রাজ্যের শাসনভার অর্পিত হইয়াছে। আমার বয়স অতি অল্প; কিন্তু যে ভগবান্ আমাকে এই উচ্চ সিংহাসনে বসাইয়াছেন, সেই ভগবান্ই আমাকে সুমতি দিবেন,—শক্তি দিবেন;—এইরূপ আশা যদি আমার না থাকিত, তাহা হইলে, আজ আমি এই বিষম ভারে অবসন্ন হইয়া পড়িতাম। ভগবান্ই আমার ভরসা। সেই ভগবান্ ভাবিয়া, দেহে ও মনে বল পাইয়া, আমি প্রজাপালন করিব।

"আমার পার্লেমেণ্ট-মহাসভার সভ্যগণ বুদ্ধিমান্ এবং কার্য্যদক্ষ। আমার প্রজাগণ আমার প্রতি স্নেহপরায়ণ ও ভক্তিমান্। প্রজাগণের স্নেহ ও রাজভক্তি, মহাসভার সভ্যগণের সুবুদ্ধি ও কার্য্যদক্ষতা,—এই কয়টী উপকরণের উপর আমি দৃঢ়তম ভিত্তি স্থাপন করিয়া, আমি এই সাম্রাজ্য চালাইতে সাহসী হইয়াছি। আমার পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাজগণ প্রজার সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও স্বাধীনতার উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া চলিয়াছেন এবং স্বদেশের আইন,—কানুনের উন্নতিকল্পে তাঁহারা যত্ন করিয়াছেন;—এমন রাজগণের উত্তরাধিকারিণীরূপে আমি সিংহাসন পাইয়াছি, তাই আশা হয়, আমার রাজত্ব সুখস্বচ্ছন্দে চলিবে।

"আমার জননী স্নেহশীলা ও সুশিক্ষিতা; তাঁহারই অধীনে থাকিয়া, আমি কেন্‌সিংটন-রাজভবনে, উত্তম শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীর সাহায্যে সুশিক্ষা লাভ করিয়াছি। আর অতি বালিকা কাল হইতেই, আমার জন্মভূমি ইংলণ্ডের শাসনপ্রণালীকে, আমি ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছি।

"সম্পূর্ণরূপে জনসাধারণকে ধর্ম্মবিষয়ক স্বাধীনতা আমি প্রদান করিব এবং এই দেশে যে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা রক্ষা করিতে আমি সতত যত্নবতী হইব। অধিকন্তু প্রজাগণের অধিকার রক্ষা করিয়া, তাহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং স্ববিধান করিব।"

ভিক্টোরিয়া তখন শপথপূর্ব্বক, ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া, ঘোষণা করিলেন,—"স্বদেশের স্বাধীনতা, আইন, এবং প্রজাদিগের স্বত্ব রক্ষা করিতে অদ্য হইতে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলাম।"

তখন মন্ত্রিসমাজের সভ্যগণ মহারাণীর আনুগত্য এবং আশ্রয় স্বীকার করিলেন। তখন একে একে সকলে মহারাণীর হস্ত চুম্বন করিয়া বিদায় হইতে লাগিলেন। পিতৃব্যগণও প্রথানুসারে রাণীর হস্ত চুম্বন করিলেন। কিন্তু ভিক্টোরিয়া—করুণাময়ী স্নেহময়ী ভিক্টোরিয়া, সম্পর্ক-বিহীন সামান্য ব্যক্তির ন্যায়, খুল্লতাতগণকে হস্তচুম্বন করিতে দেখিয়া, আবেগে আসন হইতে

উঠিলেন এবং স্নেহভাবে বৃদ্ধ খুল্লতাতকে বাহু দ্বারা বেষ্টন করিয়া, তাঁহার মুখচুম্বন করিলেন। সভায় ধন্য ধন্য ধ্বনি পড়িয়া গেল!

পরদিন ঘোষণা-উৎসব হইল। চির-প্রথা অনুসারে মহারাণী, সেণ্ট-জেম্স-রাজভবনের জানেলায় দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহার মাতা নিকটে দাঁড়াইয়া রহিলেন। এবং রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গ তাঁহাদিগকে বেষ্টন করিয়া রহিলেন। অসংখ্য লোক সেই দৃশ্য দেখিয়া যাইতে লাগিল,—এবং জয় মহারাণীর জয়—জয় মহারাণীর জয়, এই শব্দ উচ্চারণ করিতে লাগিল।

বিজয়বাদ্য বাজিল। ঘন ঘন তোপ দাগা হইতে লাগিল। এবং নৃত্য, গান ও ভোজনে সে দিন কাটিয়া গেল।

এই ঘোষণার তিন সপ্তাহ পরে ভিক্টোরিয়া, মাতার সহিত কেন্সিংটন পরিত্যাগ করিয়া, বাকিংহাম-রাজভবনে আসিলেন এবং সেইখানেই বসবাস করিতে লাগিলেন। কেন্সিংটন-রাজভবন ছাড়িলেন বটে, কিন্তু কেন্সিংটনকে ভিক্টোরিয়া কখন ভুলেন নাই! কেন্সিংটনের প্রতিবেশিগণকেও ভুলেন নাই। প্রতিবেশিগণের সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী হইতেন এবং দরিদ্রগণকে যথানিয়মে অর্থসাহায্য করিতেন।

প্রায় এক বৎসরকাল রাজত্ব করিয়া, মহারাণী ভিক্টোরিয়া রাজমুকুট ধারণ করেন। এত বিলম্বে রাজমুকুট-ধারণের কারণ এই যে, পুরাতন মুকুটখানি বড় ভারী ছিল এবং খুব বড় ছিল। কাজেই নূতন মুকুট ধারণ করিতে এই বিলম্ব হইল।

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে ২৮শে জুন ওয়েষ্টমিনিষ্টার আবি নামক গির্জ্জায়, মহারাণী, রাজমুকুট ধারণ করেন। এই উৎসব এক প্রকাণ্ড কাণ্ড! সমুদয় ইংলণ্ড, এই মহোৎসবে টলমল করিয়াছিল! কোটি কোটি লোক একত্র হইয়া মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছিল,—'মহারাণী, দীর্ঘজীবিনী হউন।' এই উৎসবকালে, মহারাণী তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের চেয়ারে উপবিষ্ট হইলেন। এই চেয়ারে তেত্রিশ জন রাজা ও চারি জন রাণী পূর্ব্বে বসিয়াছিলেন। প্রথানুসারে,

মহারাণীর

সুবর্ণের এক খণ্ড বস্ত্র মহারাণীর মাথার কাছে ধরা হইল। মহারাণীর করকমলদ্বয়ে এবং কপালে তৈলাভিষেক করা হইল। তখন রাজপুরোহিত ক্যান্‌টারবেরি, মহারাণীর মস্তকে ইংলণ্ডের রাজমুকুট পরাইয়া দিলেন। এই রাজমুকুট পরিধানপূর্ব্বক মহারাণী চেয়ার-অব্‌-হোমেজ নামক একখানি স্বতন্ত্র চেয়ারে আসিয়া বসিলেন। তখন সকলে একে একে নতজানু হইয়া মহারাণীর হস্তচুম্বন করিলেন; মহারাণীর রাজমুকুট স্পর্শ করিলেন এবং মহারাণীর বশ্যতা স্বীকার করিলেন।

এইরূপ রাজমুকুট পরিধানকালে পূর্ব্বে প্রথা ছিল, রাণীর বামগণ্ড চুম্বন করা। কিন্তু লজ্জাশীলা যুবতী ভিক্টোরিয়ার বামগণ্ড, সহস্র সহস্র যুবক এবং বৃদ্ধ দ্বারা চুম্বিত হইবে,—ইহা অনেকের ভাল লাগিল না। মহারাণীও নিতান্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তখন বামগণ্ডের পরিবর্ত্তে বামহস্ত-চুম্বনের প্রথা প্রবর্ত্তিত হইল। মহারাণী পরিত্রাণ পাইলেন!

মুকুটধারণ-উৎসব শেষ হইল। মহারাণী, জননী ও সখাগণ সঙ্গে হাসি-হাসি মুখে রাজভবনে যাত্রা করিলেন।

ভিতর মহলে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, তাঁহার প্রিয়তম ক্ষুদ্র কুকুরটী তাঁহার কণ্ঠের স্বর শুনিয়া, তাঁহাকে দেখিয়া, আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া, নাচিয়া নাচিয়া, চীৎকার করিতেছে। মহারাণী ভিক্টোরিয়া অমনি সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন,—"ড্যাস্‌! ড্যাস্‌! তুই এখানে?" এই বলিয়া কুকুরটীকে কোলে লইয়া, তাহার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে, মহারাণী কক্ষান্তরে বেশ-ত্যাগ করিতে গমন করিলেন।

মহারাণী ভিক্টোরিয়া, মুকুট-ধারণের পর,—নানা দেশ হইতে, নানা জনের নিকট হইতে নানারূপ সম্মানসূচক পত্র পাইতে লাগিলেন। এক খানি পত্র লিখিলেন, সেই মামাত ভাই—সেই ভাবী স্বামী,—সেই প্রিন্স আলবার্ট। ভিক্টোরিয়া সাগ্রহে সাহ্লাদে—সেই পত্র একবার পড়িলেন,—দুইবার পড়িলেন,—তিনবার পড়িলেন। পত্রখানি এইরূপ ঃ—

"প্রিয়তম ভগিনী!

"তোমার অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে,—তুমি ইংলণ্ডের রাণী হইয়াছ;—আজ আমার আহ্লাদের সাগর উথলিয়া উঠিয়াছে। তাই দুই চারি কথা লিখিতেছি।

"ইউরোপ প্রদেশের মধ্যে ইংলণ্ড শ্রেষ্ঠ এবং শক্তিসম্পন্ন রাজ্য। সেই ইংলণ্ডের তুমি অধীশ্বরী; আজ তুমি কোটি কোটি প্রজার সুখ-সম্পাদনের কর্ত্রী। ভগবান্ তোমার সহায় হউন। ভগবান্ তোমার দেহে এবং মনে বল দিউন; তুমি তোমার ঐ রাজ্যশাসনরূপ মহৎ এবং গুরুতর কার্য্য অবশ্যই সুসম্পন্ন করিতে সক্ষম হইবে।

"আমি আশা করি, প্রার্থনা করি, তোমার রাজত্ব বহুকালস্থায়ী হউক; সুখ-স্বচ্ছন্দে পূর্ণ হউক এবং গৌরবময় হউক। তোমার প্রজাবর্গ তোমার সৎকর্ম্মে সাধু চেষ্টা দেখিয়া, তোমাকে ভালবাসুক; ভক্তি করুক এবং তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ হউক।

"এই জর্ম্মণ-রাজ্যের অন্তর্গত বন্ নগরে তোমার দুই ভ্রাতা,—আমরা বসবাস করিতেছি। তুমি এখন রাজকার্য্যে সদাই বিব্রত। সেই ভ্রাতৃদ্বয়ের কথা, মধ্যে মধ্যে তোমাকে ভাবিবার জন্য, অনুরোধ করিতে পারি কি? আজ পর্য্যন্ত যাহাদের জন্য তুমি স্নেহ, ভালবাসা ও মমতা দেখাইয়া আসিতেছ, তাহা অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্য তোমাকে অনুরোধ করিতে পারি কি! নিশ্চয় জানিও, আমাদের মন তোমার সঙ্গে সঙ্গেই আছে। তোমার সময় এখন মূল্যবান্,—বেশী কথা লিখিয়া, তোমার সময় নষ্ট করিতে চাহি না!

মহারাণীর একান্ত বাধ্য ও বিশ্বস্ত ভৃত্য

—'আলবার্ট।'

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

বালিকা ভিক্টোরিয়া যৌবনে রাণী হইলেন। যেমন-তেমন রাণী নহেন,—ইংলণ্ডের অধীশ্বরী হইলেন। ভাগ্যফল কেহই খণ্ডন করিতে সমর্থ নহে। ভিক্টোরিয়ার জন্মকালে কে ভাবিয়াছিল যে, এই দুঃখিনী রাজনন্দিনী ইংলণ্ডের স্বর্ণ সিংহাসন একদিন সুশোভিত করিবেন? কালক্রমে যাহা ঘটিবার, তাহা ঘটিল,—লোকে কেবল চাহিয়া-চাহিয়া তাহাই দেখিল।

ইংলণ্ডের অনেক বড় বড় লোক স্থির করিলেন, এই বালিকা দ্বারা,—এই একফোঁটা-মেয়ে দ্বারা, ইংলণ্ডের রাজ্যশাসন সুচারুরূপে হইবে না। ইংরেজ-রাজত্বের শ্রীবৃদ্ধি হইবে না; ইংরেজ-বীরত্বের যশঃসৌরভে দশদিক্ পূর্ণ হইবে না। কিন্তু ক্রমশঃ লোকে দেখিল, বুঝিল, জানিল, তাঁহাদের ভুল ধারণা হইয়াছিল। ইংলণ্ডেশ্বরী কর্ত্তব্যপরায়ণা এবং তেজস্বিনী। ভিক্টোরিয়ার এই ষাট বৎসরকাল রাজত্বমধ্যে যত সুখ সম্পদ্ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইয়াছে,—রাজ্য যত বিস্তার লাভ করিয়াছে,—ব্রিটিশ-জয়পাতাকা দেশ-বিদেশে যত উড্ডীন হইয়াছে, সেরূপ আর অন্য কোন ইংলণ্ডেশ্বর বা ইংলণ্ডেশ্বরীর রাজত্বে ঘটে নাই বলিলে, অত্যুক্তি হয় না। তাই বলিতে হয় যে, ভিক্টোরিয়া পরম ভাগ্যবতী, লক্ষ্মী-স্বরূপিণী রমণী;—ভিক্টোরিয়া মর্ত্ত্যের মানবী নহেন,—স্বর্গের দেবী। যাঁহার রাজত্বে সূর্য্যদেব কখন অস্তগত হন না, তাঁহাকে ঐশী শক্তি-সম্পন্না মহাদেবী বলিব না ত কি?

ইংলণ্ডে বেলা আটটায় অতি প্রত্যূষকাল। ভিক্টোরিয়া বেলা আটটার সময় উঠিতেন; প্রাতঃকার্য্য সমাপন করিয়া কিছু জলযোগ করিতেন। তারপর তিনি রাজকীয় কাগজ-পত্রাদি দেখিতেন; বড় বড় নথি পাঠ করিতেন; যে সকল কাগজে তাঁহার স্বাক্ষর করা দরকার, তাহাতে নাম-সহি করিতেন; এবং আপন মন্তব্য ও আদেশ লিখিতেন। ভিক্টোরিয়ার আদেশ অনুসারে রাজ-সেরেস্তার সমুদয় কাগজ-পত্রই তাঁহার সম্মুখে ধরা হইত কম-দরকারী বিষয়

কোন কাগজ, যদি তাঁহার নিকট না লইয়া আসা হইত, তাহা হইলে তিনি বলিতেন, "বেশী-দরকারী হউক আর কম-দরকারী হউক,—সকল কাগজই আমার নিকট আনা চাই; তবে আমি পড়ি আর না পড়ি, সে স্বতন্ত্র কথা।" এইরূপে ভিক্টোরিয়ার আদেশানুসারে প্রত্যহ গাড়ী বোঝাই করিয়া রাজকীয় কাগজ-পত্র তাঁহার ভবনে আনা হইতে। কোন্ কোন্ কাগজে কি কি বিষয় লেখা আছে, একজন রাজ-কর্ম্মচারী তাঁহাকে বুঝাইয়া দিতেন, ইহার মধ্যে তাঁহার যে কাগজ পড়িতে সখ ও সুবিধা হইত, সেই কাগজ তিনি পাঠ করিতেন। এইরূপে বেলা প্রায় সাড়ে দশটা বজিত।

রাজকার্য্য-সমাপনান্তে বেলা দশটা বা সাড়ে দশটার সময় ভিক্টোরিয়া আহারে বসিতেন। একজন সহচরী তখন ভিক্টোরিয়ার জননীকে, ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে একত্র আহার করিবার জন্য ডাকিয়া আনিত। রাণী হইবার পর হইতে, ভিক্টোরিয়া না ডাকিলে, মাতা কন্যার নিকট আসিতেন না। জননী বড় বুদ্ধিমতী ছিলেন। ভিক্টোরিয়ার সঙ্গে এই সময় তিনি যে সকল কথা-বার্ত্তা কহিতেন, তাহাতে রাজনীতির কোন কথা থাকিত না। সরল-ভাবে, অতি সাবধানে মাতা কেবল কন্যার সহিত আহারের কথা, সঙ্গীতের কথা, ক্রীড়ার কথা এবং ভ্রমণের কথাই কহিতেন।

মাতা নিকটে আসিবামাত্র, ভিক্টোরিয়া মায়ের সহিত খাইতে বসিতেন। এখন আর দরিদ্র-কন্যা নাই,—ভিক্টোরিয়া মহারাণী;—ভোজন-সামগ্রী অতীব মূল্যবান্ এবং সুস্বাদু।—চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় সামগ্রীর কথা কত বর্ণন করিব? আহারান্তে কিছুকাল বিশ্রাম। বিশ্রামের পর ভিক্টোরিয়ার নিকট মন্ত্রী মেল্‌বোর্ণ আসিতেন। কোনদিন বেলা এগারটা, কোনদিন বেলা দুপুর,—এই সময়ই, ভিক্টোরিয়ার সহিত রাজমন্ত্রীর সাক্ষাতের কাল নির্দ্দিষ্ট ছিল। প্রায় দেড় ঘণ্টা বা দুই ঘণ্টা কাল মেল্‌বোর্ণ ভিক্টোরিয়ার নিকট উপস্থিত থাকিয়া, তাঁহাকে রাজকার্য্য শুনাইতেন, বুঝাইতেন এবং উপদেশ দিতেন। বেলা দুইটার পর ভিক্টোরিয়া ভ্রমণে বহির্গত হইতেন। রাজবাটীতে যত

স্ত্রী-পুরুষ থাকিত, সকলেই মহারাণীর সহিত ভ্রমণার্থ যাইত। কারণ মহারাণী, দল বাঁধিয়া ভ্রমণ করিতে বড় ভাল বাসিতেন। তিনি ঘোড়ায় চড়িয়া ভ্রমণের বড় পক্ষপাতিনী ছিলেন। প্রত্যহই প্রায় বড় ঘোড়ায় চড়িয়া, সখীগণ এবং সখাগণ সমভিব্যাহারে অতি দ্রুতবেগে যাইতেন। তাঁহার ঘোড়ার গ্যালপ-গতি-ছারতক-ভিন্ন অন্য গতি ছিল না। এরূপ নক্ষত্রবেগে দৌড়িতেন যে, লোকে দেখিয়া অবাক্ হইত। এরূপ ঘোড়দৌড় কালে মন্ত্রিবর মেল্‌বোর্ণ ঘোড়ায় চড়িয়া, মহারাণীর বাম পার্শ্বে পার্শ্বে যাইতেন। অন্যান্য স্ত্রী এবং পুরুষ—কেহ পশ্চাতে থাকিত, কেহ সম্মুখে থাকিত, কেহ বা দক্ষিণদিকে অবস্থিতি করিত। মহারাণীর ঘোড়দৌড়-ব্যাপার এক অপূর্ব্ব কাণ্ড। প্রত্যহ বহু দর্শক সেই ঘোড়দৌড় দেখিবার জন্য রাজ-পথে আসিয়া জনতা বৃদ্ধি করিত। এইরূপ দুই ঘণ্টাকাল ঘোড়ার উপর ছুটাছুটি করিয়া, মহারাণী রাজভবনে প্রত্যাগমন করিতেন। বৈকালে বিশ্রামের পর সঙ্গীত আরম্ভ হইত। সপ্তাহে তিন দিন, বৈকালে নাচ হইত। তার পর সন্ধ্যার সময় ভোজন আরম্ভ। উত্তম-মধ্যম ভোজন,—উদর পূর্ণ করিয়া ভোজন। ছোট ছোট ছেলে-মেয়ের সহিত খেলা করিতে, মহারাণী বড়ই ভাল বাসিতেন। সেই জন্য রাজভবনে অনেক-গুলি ছেলে-মেয়ে আনিয়া রাখা হইত। সন্ধ্যার সময় সেই সকল ছেলে-মেয়ে লইয়া, মহারাণী সহচরীগণ-পরিবৃতা হইয়া, মহানন্দে, পবিত্র স্বর্গীয় খেলা খেলিতেন। রাত্রি দশ ঘটিকার সময় আবার ভোজন। এ ভোজনে অনেক ভদ্র ভদ্র ব্যক্তি যোগদান করিতেন। এই ভোজনের ঈষৎ পূর্ব্বেই তাস-খেলা চলিত। ভিক্টোরিয়ার জননী হুইষ্ট-তাস-খেলায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। মেল্‌বোর্ণ এ খেলায় যোগ দিতেন। আর এই নৈশ আহারের সময়, মেল্‌বোর্ণ মহারাণীর বামে বসিয়া আহার করিতেন; এবং তাঁহার নানারূপ গল্প শুনিয়া, অনেকেই মোহিত হইতেন। ভোজনকালে ও ভোজনান্তে, মধুর রবে পিয়ানো বাজিতে থাকিত। মধুর-মধুর শ্রুতিসুখকর গল্প হইত; আর মধুর-মধুর রসনা-সুখকর ভোজন-সামগ্রী ভক্ষিত হইত।—স্বর্গে এমন আছে কি?

রাত্রি এগারটার পর, সকলে স্ব স্ব গৃহে গমন করিতেন। ভিক্টোরিয়া, আপন নির্দ্দিষ্ট কক্ষে ঘুমাইতেন। ভিক্টোরিয়ার জননী স্বতন্ত্র কক্ষে শুইতেন। মেল্‌বোর্ণ ভিক্টোরিয়াকে বড়ই ভাল বাসিতেন। কন্যার ন্যায় ভিক্টোরিয়াকে দেখিতেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

ভিক্টোরিয়া রাণী হইয়া, মাসিক (এখনকার দরে) সাড়ে চারি লক্ষ টাকা, আপন ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য, বৃত্তি পাইতে লাগিলেন। অসচ্ছল সংসারে সুতরাং অর্থের সচ্ছলতা হইল। ভিক্টোরিয়া জননীকে বলিলেন, "মা, এই ত শুভদিন আসিয়াছে। এ সময় পিতৃ-ঋণ পরিশোধ করা কি আমাদের পক্ষে উচিত হয় না?"

জননী। বৎসে, তোমার মুখে এই কথা শুনিয়া, আজ আমি যে কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম, তাহা বলিতে পারি না। আমার স্বামী,—তোমার পিতা, ঋণজালে জড়িত হইয়া কত কষ্টে যে কালযাপন করিয়াছিলেন, তাহা তুমি জান না;—কিন্তু আমার হৃদয়ে তাহা সদাই জাগরূক আছে।—তুমি এখন ইংলণ্ডের রাণী,—সে ঋণ পরিশোধ করা তোমার একান্ত বিধেয়। বিশেষ, সে ঋণ আমার হৃদয়ে শেলসম বিদ্ধ আছে। এই ঋণপরিশোধের কথা, আমিই তোমাকে আগে বলিব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু তুমি যে আপনা হইতে সে কথা উত্থাপন করিয়াছ, ইহাতে আজ আমি ধরাধামে স্বর্গসুখ পাইলাম।

এই কথা বলিতে বলিতে, জননী বাষ্পগদ্গদকণ্ঠে কন্যাকে বাহু দ্বারা আলিঙ্গন-পূর্ব্বক, তাঁহার মুখচুম্বন করিলেন এবং অবিরাম অবিশ্রান্ত নয়নজলে ভাসিতে লাগিলেন। পিতার কথা মনে পড়িল, পিতা যে কেমন বন্ধ

ছিলেন,—পিতাকে যে দেখেন নাই, এ কথাও হৃদয়মধ্যে উত্থিত হইল।—মায়ের কষ্টের কথা মনে পড়িল। ভিক্টোরিয়াও কাঁদিতে লাগিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, "মা, কাঁদিবেন না,—আমি অদ্যই পিতার ঋণপরিশোধের প্রস্তাব করিব।"

মাতা কক্ষান্তরে গমন করিলেন। মন্ত্রী মেলবোর্ণ আসিয়া, ভিক্টোরিয়ার নিকট উপনীত হইলেন। ভিক্টোরিয়া করুণ-কণ্ঠে মন্ত্রিবরকে কহিলেন, "আমি পিতৃ-ঋণ শোধ দিয়া, পিতাকে উদ্ধার করিব। এই পবিত্র স্বর্গীয় কার্য্য ব্যতীত আমার প্রাণধারণ বৃথা।"

মেলবোর্ণ, এই যুবতী মহারাণীর করুণ-কণ্ঠের উক্তি শুনিয়া আর থাকিতে পারিলেন না;—তাঁহার চক্ষে জল আসিল। তিনি উত্তর দিলেন,—"তথাস্তু। অচিরে পিতৃ-ঋণ শোধ হইবে।" যে কয় জন ঋণদাতা পিতার সহিত সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন, ভিক্টোরিয়া ঋণশোধ দিয়াও, তাঁহাদিগকে বহুমূল্যের পারিতোষিক প্রদান করিলেন। মহারাণীর সৎকার্য্যে ইংলণ্ডের প্রজাগণ সাধুবাদ করিতে লাগিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

একজন ইংরেজ ইতিহাসবেত্তা লিখিয়াছেন, "ভিক্টোরিয়াই ইংরেজের ভাগ্যলক্ষ্মী। পূর্ব্বে ইংলণ্ডে রেলগাড়ী ছিল না, ষ্টীমার ছিল না; ভিক্টোরিয়ার রাজ্যের আরম্ভ হইতে রেলপথের সৃষ্টি এবং কলের জাহাজের সৃষ্টি; আর ইহার কিছুদিন পরে তারযোগে সংবাদ পাইবার পরীক্ষা আরম্ভ হইল। তখন বাজারে সেই সবেমাত্র দিয়াশালাই উঠিয়াছে। প্রত্যেকটীর মূল্য ছিল চারি পয়সা। লোকে দিয়াশালাই কিনিতে—সখের জন্য, গৃহে রাখিবার জন্য,—আলো জ্বালিবার জন্য নহে। এখন যেরূপ ইংলণ্ডের বাণিজ্য বিস্তৃত

হইয়াছে, ভিক্টোরিয়া রাণী হইবার পূর্ব্বে ইহার সিকি রকম বাণিজ্যেরও বিস্তার ছিল না। এখন ইংলণ্ডে যেরূপ কল-কারখানার অপূর্ব্বকাণ্ড, ভিক্টোরিয়া রাণী হইবার পূর্ব্বে ইহার দশমাংশের একাংশও ছিল না। মহারাণীর রাজত্বের প্রারম্ভে নানা দিকে বিদ্রোহাগ্নি জলিতেছিল; অনাবৃষ্টি-নিবন্ধন কৃষককুল হাহা রব করিতেছিল, এবং অন্নকষ্ট-নিবন্ধন, দ্রব্যের দুর্মূল্যতা-নিবন্ধন সওদাগর-গণ ও প্রজাপুঞ্জ সর্ব্বস্বান্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। কিন্তু ভিক্টোরিয়ার সিংহাসনপ্রাপ্তির কয়েক মাস পরেই সুবৃষ্টি হইল; শস্য জন্মিল; অন্নকষ্ট ঘুচিল;—সওদাগরদল আবার হাসিল।" ইহাঁরই রাজত্ব কালে, ইংরেজ সমগ্র ভারতবর্ষের সর্ব্বময় কর্ত্তা হন। মহারাষ্ট্রীয় শক্তির হ্রাস হয়; পঞ্জাব প্রদেশের শিখ-সৈন্য সমরে পরাজিত হয়; দিল্লীর শেষ-বাদশাহ বন্দী হইয়া ব্রহ্মদেশে আনীত হয়; লক্ষ্ণৌয়ের নবাব মুচিখোলায় অবস্থিতি করে; আর টিপু সুলতানের বংশধরগণ বাঙ্গালা দেশে আসিয়া বাস করিতে থাকে। আমেরিকায়, আফ্রিকায়, অষ্ট্রেলিয়ায়,—ইংলণ্ডের প্রভুত্ববৃদ্ধি হয়। অধিক কি, ক্রিমিয়া-মহা-সমরে, রুষের সহিত যুদ্ধ করিয়া, ইংরেজ দিগ্বিজয়ী বলিয়া পরিগণিত হন। ধন্য রাণী ভিক্টোরিয়া! ধন্য তোমার দৈবী শক্তি! আর ধন্য তোমার মহামহিমা!

ভিক্টোরিয়া খর্ব্বাকৃতি। তাঁহার উচ্চতা পাঁচ ফিট দুই ইঞ্চি। খর্ব্বা স্ত্রী ইংলণ্ডে সুন্দরী বলিয়া কখন পরিচিত হন না। ভিক্টোরিয়াকে দেহতত্ত্ববিদ্-গণ কখন সুন্দরী বলেন নাই। কিন্তু তাঁহার মুখমণ্ডল দিয়া এমন এক জ্যোতি বাহির হইত যে, তাহা দেখিলেই লোকে মোহিত হইত এবং তাঁহাকে লোকে ভাল বাসিতে, পূজা করিতে, ভক্তি করিতে, ইচ্ছা করিত। যৌবনে তাঁহার চক্ষের চাহনি তীব্র অথচ মধুর ছিল। তাঁহার সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি দ্বারা লোকের হৃদয় হইতে ভয় ভক্তি উভয়ই আকর্ষিত হইত। তাঁহার গঠন বেশ গোল-গাল নবীন-নধর ছিল। বিধাতা মহারাণীকে এমনই ভাবে গড়িয়াছিলেন যে, চল্লিশ বা পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সেও, মহারাণীকে যুবতীর ন্যায় দেখাইত।

তবে রাজভোগে থাকিয়া, ক্রমশঃ কিছু মোটা হইয়া পড়ায়, তাঁহার চেহারার সে খুঁৎ-টুকু কমিয়াছিল। কোন কোন জীবনচরিত-লেখক বলিয়া গিয়াছেন, "মহারাণী সুন্দরী না হইলেও সুন্দরী।" যৌবনে মহারাণীর লাবণ্যপ্রভা যে দেখিত, অনেক সময় সে ব্যক্তি মোহিত হইত। ভিক্টোরিয়ার গঠন যাহাই হউক, কিন্তু সেই লাবণ্যটুকু দেবীদুর্লভ। সেই ঝলমলে, চক্‌চকে রঙের নিকট সকলেই বুঝি অবনতবদন। তাঁহার কণ্ঠধ্বনি বড়ই মধুর ছিল। পার্লিয়ামেণ্টে যখন তিনি বক্তৃতা করিতেন, সভ্যগণ চিত্রার্পিতের ন্যায়, সে স্বর্গীয় কণ্ঠস্বর শুনিতেন। উৎকৃষ্ট পিয়ানো-স্বর ভাল, কি মহারাণীর কণ্ঠস্বর ভাল,—শুনা যায়, এ কথা লইয়া অনেক সময় বাক্‌বিতণ্ডাই হইত। ফল কথা, তৎকালে "ইউরোপে কি স্ত্রী, কি পুরুষ, এমন মধুর কণ্ঠ কাহারও ছিল না"—একথা বহু ব্যক্তি তখন বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

ভিক্টোরিয়া গুণবতী। একে নারী, তাহাতে যুবতী, তাহার উপর অবিবাহিতা,—সুতরাং সংসারে অনাথিনী অবলা অতএব রাজকার্য্যে ভিক্টোরিয়া কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ হইবেন, তাহাতে বিচিত্রতা কি?—কলের ছবির ন্যায় তিনি নাচিবেন, গাহিবেন, কথা কহিবেন, তাহাতে বিচিত্রতা কি? ভিক্টোরিয়া পরবুদ্ধিতে চলিবেন,—পরের কথায় উঠিবেন, পরের কথায় বসিবেন,—পরের কথায় মজিবেন,—ভিক্টোরিয়ার সিংহাসনপ্রাপ্তির পর হইতে অনেকে এ বিষয়টীকে স্থির-নিশ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু দুই এক মাসের মধ্যেই লোকের সে ভ্রম ঘুচিল। তাঁহারা অবিলম্বেই দেখিলেন, ভিক্টোরিয়ার মধ্যে তেজ আছে, উত্তাপ আছে, বহ্নি আছে;—বুঝিলেন, এ মেয়ে সামান্য মেয়ে নয়! মন্ত্রিবর মেল্‌বোর্ণ একদিন আপন বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন, "আমি দশটী রাজাকে এক কালে সহজে চালাইয়া লইতে পারি; কিন্তু এই একটী রাণীকে চালানো আমার পক্ষে বড়ই কঠিন-কর্ম্ম হইয়া উঠিয়াছে।" ইহাতেই ভিক্টোরিয়ার কৃতিত্ব, শক্তি, সামর্থ্য বুঝা যায়। নারী-স্বভাব-সুলভ কোমল হৃদয়ের সহিত, ইংলণ্ডেশ্বরীর গৌরবময় হৃদয় একত্র মিলিত হইয়াছিল।

এক দিন মহামন্ত্রী মেলবোর্ণ, মহারাণীর সম্মুখে উপনীত হইয়া কহিলেন, "হে ইংলণ্ডেশ্বরি! আমি কোন গুরুতর রাজকর্ম্মে আপনার নিকট আসিয়াছি, আপনি এই কাগজখণ্ড এখনই সহি করুন।"

রাণী উত্তর দিলেন,—"আমি ঐ কাগজখানি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে না পড়িয়া, না দেখিয়া, না বুঝিয়া কেমন করিয়া সাহ করিব?"

মন্ত্রী মহাশয় কাতরকণ্ঠে কহিলেন, "বড় দরকার,—এখনি সহি করুন। এখনি সহি করিলে বড়ই সুবিধা হয়।"

মহারাণী গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন, "যে দলিল সম্বন্ধে আমার সম্পূর্ণরূপ জ্ঞান জন্মে নাই, তাহাতে আমার সহি করা উচিত কি না, তাহাই আমার কাছে এখন সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর প্রশ্ন।"

মন্ত্রিবর যোড়হাতে বলিলেন, "সুবিধা হইবে বলিয়াই এত তাড়াতাড়ি সহি রিতে বলিতেছি।"

মহারাণী ধীর অথচ গম্ভীরস্বরে উত্তর দিলেন, "প্রভু! কোন্‌টা ভাল কান্‌টা মন্দ, এ বিষয়ে বিচার করিয়া বুঝিতে আমি শিক্ষা পাইয়াছি; াপনি কিন্তু, যে সুবিধার কথা বলিতেছেন, এস্থলে সেই সুবিধার কথা ামি শুনিতেও চাহি না, বুঝিতেও চাহি না।"

মন্ত্রিবর নীরব হইলেন। ভিক্টোরিয়া আপন ইচ্ছামত বহুক্ষণ ধরিয়া সেই লিল পাঠ করিলেন। শেষে পরিতুষ্ট হইয়া, দলিল সহি করিয়া, মন্ত্রী হাশয়ের হাতে দিলেন।

ডিউক-অব্ ওয়েলিংটন ওয়াটারলু-বিজয়ী। তিনি তখন ইংরেজ-সেনার র্ব্বপ্রাধান কর্ত্তা। কোন এক সৈনিক-পুরুষ আপন দল হইতে উপরি উপরি নবার পলাইয়াছিল। শেষবার বিচারে ওয়েলিংটনের অনুমতিক্রমে, সেই নিকের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হয়। প্রধানসেনাপতি ডিউক-অব্-ওয়েলিংটন ই প্রাণদণ্ডাজ্ঞার পত্র লইয়া, ইংলণ্ডেশ্বরীর স্বাক্ষরের নিমিত্ত তাঁহার নিকট পস্থিত হইলেন। প্রাণদণ্ডের এই ভীষণ সংবাদ পাঠ করিয়া, মহারাণীর

কোমল প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। 'পলায়ন অপরাধে প্রাণদণ্ড হইবে!'—এইকথা বলিতে বলিতে মহারাণীর চক্ষু হইতে বারিধারা বহির্গত হইতে লাগিল। সজল-নয়না ভিক্টোরিয়া ওয়েলিংটনের মুখের দিকে চাহিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে জিজ্ঞাসিলেন, "এই ব্যক্তির স্বপক্ষে বলিবার কি কোন কথা নাই?" কঠিনহৃদয় লৌহময় ডিউক যোড়হাতে কহিলেন, "না মহারাণি,—কিছুই নাই। এই ব্যক্তি বার বার তিন বার পলাইয়াছিল।"

মহারাণী। আপনি কৃপা করিয়া আর একবার ভাবিয়া দেখুন দেখি,—এই সৈনিকপুরুষের কোন গুণ ছিল কি না?

ডিউক। এই ব্যক্তি বড়ই দুরাচার ও দুর্বৃত্ত সৈনিক। কিন্তু কেহ কেহ ইহার বিচারকালে এমন কথা বলিয়াছিলেন যে, এই সৈনিক ব্যক্তিগত চরিত্রবান্ লোক এবং ইহার স্বভাব ভাল। গার্হস্থ্য-জীবনে এই সৈনিক-পুরুষ বেশ ভাল লোক হইয়া কাজ করিতে পারে।

মহারাণী। ধন্যবাদ—ধন্যবাদ—আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ!

এই কথা বলিয়া ইংলণ্ডেশ্বরী, সেই সুন্দর তানলয়-সংযুক্ত সুকণ্ঠে এক সুগভীর ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন এবং ভীষণ পার্চ্চমেণ্ট কাগজখণ্ডের উপর "আমি ক্ষমা করিলাম"—এই কথা লিখিয়া, আপন সুন্দর নাম সুন্দর অক্ষরে সতেজে সহি করিলেন।

সৈনিক-পুরুষ অব্যাহতি পাইল।

ভিক্টোরিয়া রবিবারে কোনরূপ রাজকার্য্য করিতেন না। ভগবানের উপাসনাতেই দিন কাটাইতেন। একদিন মেল্‌বোর্ণ শনিবার রাত্রি প্রায় এগারটার সময় আসিয়া কহিলেন, "আজ রাত্রি অনেক হইয়াছে,—সময় আর নাই; কল্য রবিবার প্রাতে এই কাগজ-পত্রগুলি বিশেষরূপে পড়িয়া আপনাকে সহি করিতে হইবে। বিষয় বড়ই গুরুতর।"

মহারাণী উত্তর দিলেন,—"মন্ত্রিবর! বলেন কি? রবিবার প্রাতে আমাকে কি বিষয়-কর্ম্ম করিতে হইবে?"

মন্ত্রী। কিন্তু রাজ-কার্য্য যে, না করিলে নয়! হে ইংলেণ্ডেশ্বরি! আমায় ক্ষমা করিবেন;—নিতান্ত দায়ে পড়িয়াই আপনাকে আমি একথা বলিতেছি।

মহারাণী। আমি জানি, রাজকার্য্য সাধন করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। আচ্ছা, তাহাই হইবে। কল্য প্রাতে আপনি এবং আমি গির্জ্জাভবনে গিয়া, ঈশ্বরের ভজন শুনিয়া আসিয়া, আপনার সাক্ষাতেই কাগজ-পত্র পাঠ করিব এবং সহি করিব।

প্রভাত হইল। রবিবারে, মহারাণী সহচরীগণ-পরিবৃত হইয়া, ভজনালয়ে গমন করিলেন। আদেশ অনুসারে মন্ত্রী মেল্‌বোর্ণ সেই ভজনগৃহে উপস্থিত হইলেন। পণ্ডিত পাদ্রী সাহেব মধুরস্বরে বক্তৃতা দিলেন, "ভাই সকল! রবিবার সকলে ঈশ্বরের নাম ও ভজন লইয়া কাটাইও,—অন্য বৈষয়িক কর্ম্ম করিও না। যদি সাতদিনের মধ্যে একদিনকাল প্রভুর নাম না লইবে,—তাহা হইলে, তোমাদের আর রক্ষা কোথায়?—জীবনেরই বা প্রয়োজন কি? ছয়দিন পাপ করিতেছ, একদিন কি পুণ্য করিবে না? ছয় দিন বিষয়-বিষে জর্জ্জরিত হইতেছ, একদিন কি সুধাপান করিবে না?"

পাদ্রী মহোদয়ের এইরূপ নানাকথা-পূর্ণ বহুক্ষণব্যাপী বক্তৃতা ও গান হইল। শেষে তিনি স্পষ্টতঃ সকলকে বলিয়া দিলেন,—"রবিবারে যে ব্যক্তি বিষয়-কর্ম্মে উন্মত্ত হয়, সে ব্যক্তি মহাপাতক সঞ্চয় করে। তাহার মুখ নরকতুল্য; সে মুখের পানে তাকাইলেও পাপ আছে।"

সভা ভঙ্গ হইল। মহারাণীর সহিত সকলে রাজভবনে আসিলেন। এই বক্তৃতা শুনিয়া কৌশলী, বুদ্ধিমান মন্ত্রীর চক্ষু স্থির হইল। গৃহে আসিয়া নীরব, নিথর মন্ত্রীকে মহারাণী জিজ্ঞাসিলেন, "মন্ত্রিবর! অদ্যকার বক্তৃতা কেমন শুনিলেন?"

মন্ত্রী কহিলেন, "বড়ই ভাল লাগিয়াছে।"

মহারাণী হাসিতে লাগিলেন। হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তবে এখন খুলিয়াই বলি! আমি পাদ্রী মহাশয়কে এইরূপ ভজন-উপদেশ দিবার কথা

কল্য বলিয়া রাখিয়াছিলাম। এখন আশা করি, পাদ্রীর উপদেশ শুনিয়া, আমরা সকলেই সন্তুষ্ট ও লাভবান্ হইয়াছি।"

মন্ত্রী মেল্‌বোর্ণ রবিবার দিন রাজকীয় কাগজ-পত্রাদি পাঠের কথা, মহারাণীকে আর বলিলেন না। ধর্ম্মের উপদেশ, ধর্ম্মের কথায়, ধর্ম্মের সঙ্গীতে, ধর্ম্মের খেলায় এবং ধর্ম্মগ্রন্থপাঠে রবিবার দিন, দেখিতে দেখিতে কাটিয়া গেল। রাত্রি এগারটার সময় মহারাণী যখন শয়ন করিতে যান, তখন মেল্‌বোর্ণকে বলিলেন; "কল্য অতি প্রাতে আপনার রাজকীয় কাগজপত্র আমি পাঠ করিব; সাতটার সময় পাঠ করিলে যদি অসুবিধা হয়,—বলেন ত,—আমি ছয়-টার সময় পাঠ আরম্ভ করিব।" মেল্‌বোর্ণ উত্তর করিলেন, "না না, রাত্রি থাকিতে,—এত সকাল-সকাল, পাঠ করিবার আবশ্যকতা নাই। নয়টার সময় রাজকীয় কাগজ-পত্র পাঠ করিলেই যথেষ্ট হইবে।"

তাই মেল্‌বোর্ণ আপন প্রিয় বন্ধুর নিকট বলিয়াছিলেন, "দশটী রাজাকে চালাইয়া লওয়া আমার পক্ষে সহজ; কিন্তু একটী রাণীকে লইয়া আমি অস্থির হইয়াছি।"

ভিক্টোরিয়া সহচরীবৃন্দকে বিশেষ শাসনে রাখিতেন; বিশেষ ভালও বাসিতেন। তাঁহার হুকুম বড় কড়া ছিল। যদি কোন সখী আলস্য বশতঃ তাঁহার আদেশ-প্রতিপালনে একটু ইতস্ততঃ করিত, বা বিলম্ব করিত, তাহা হইলে, তিনি সেই সখীকে মৃদুমন্দ ভর্ৎসনা করিতেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে কাজ না হইলে, মহারাণী বড়ই চটিয়া উঠিতেন। একমিনিট এদিক-ওদিক হইবার যো ছিল না। কোন উচ্চবংশে'দ্ভবা মহিলা,—নবীনা ভিক্টোরিয়ার সখীপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি আলস্য বশতই হউক বা যে-কোন কারণেই হউক, নির্দ্দিষ্ট সময়ে মহারাণীর নিকট পঁহুছিতে পারিতেন না। এইরূপ একদিন গেল। দ্বিতীয় দিন মহারাণী তাঁহাকে বলিলেন, "দেখ, আমি তোমার জন্ম পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করিয়াছি!—সময়ের মূল্য কত জান?" তারপর সখী কিছুদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে আসিয়া, আবার একদিন অনির্দ্দিষ্ট সময়ে আসিলেন।

এদিকে মহারাণী ঘড়ী হাতে করিয়া তাঁহার জন্য বসিয়া আছেন। সেই সম্ভ্রান্ত-মহিলা, মহারাণীর হস্তে ঘড়ি দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন যে, নির্দ্দিষ্ট সময়ে পঁহুছিতে পারেন নাই বলিয়া মহারাণী তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। তিনি অতি সঙ্কুচিত হইয়া আস্তে-ব্যস্তে বলিলেন, "আমি বড়ই মন্দভাগিনী! দেখিতেছি, আপনি আমার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছেন।"

মহারাণী সুগম্ভীরস্বরে উত্তর দিলেন—"হাঁ, দশমিনিটের অধিক কাল আমি তোমার অপেক্ষায় বসিয়া আছি। তোমার প্রতি আমার এই বিশেষ অনুরোধ জানিও যে, কদাচ আর কালবিলম্ব করিও না। এই আমার শেষ কথা। আর যেন তোমাকে এসম্বন্ধে কোন কথা বলিতে না হয়।"

সম্ভ্রান্ত-মহিলা ভীত হইলেন; কাঁদিতে লাগিলেন; তাঁহার গায়ের বস্ত্র খসিয়া পড়িবার উপক্রম হইল। কম্পিতা মহিলা, শালখানি উত্তমরূপে গায়ে দিতে পারিতেছেন না দেখিয়া, মহারাণী আপন আসন হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং সম্ভ্রান্ত-মহিলার শালখানি তাঁহার গায়ে পরাইয়া দিয়া, অতি মধুর ভাষায় কহিলেন, "আমার প্রার্থনা এই, কালে আমরা সকলেই যেন কর্ত্তব্যকর্ম্ম সাধনে সক্ষম হই। ভদ্রমহিলে! ভয় কি! যত্ন করিলে তুমিও এ কার্য্যে শীঘ্রই তৎপরা হইবে। এক্ষণে এই চেয়ারে উপবেশন কর।"

এইরূপে বালিকা মহারাণীর চরিত্র ফুটিতে লাগিল। মহারাণীকে তেজস্বিনী এবং চরিত্রবতী রমণী জানিয়া, তখন অনেকে বলাবলি করিল, "ইনিই ইংলণ্ডেশ্বরী হইবার যোগ্যপাত্রী, আমরা ভুল বুঝিয়াছিলাম। ইনি ক্রীড়া-কন্দুক নহেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

ঘরে যুবতী আইবুড় কন্যা থাকিলে, অনেকেরই চক্ষু তাঁহার উপর পড়ে। বিশেষতঃ সেই যুবতীর মুখচ্ছবি যদি লাবণ্যময়ী হয়,—নয়ন দুটী নীলপদ্মের ন্যায় হয়,—নাসিকা বাঁশরীর ন্যায় হয়, তাহা হইলে ত সোণায় সোহাগা ঘটে। আর এই সকল উপকরণের উপর সেই যুবতী যদি অতুল সম্পত্তির অধীশ্বরী হন,—সুবিশাল রাজ্যের যদি বিধাত্রী হন,—কোমলহৃদয়া হন, এবং দয়া-দাক্ষিণ্যবতী হন, তাহা হইলে ত আর রক্ষাই থাকে না। ভিক্টোরিয়া লাবণ্যবতী যুবতী, ইংলণ্ডের অধীশ্বরী,—রাজকার্য্যে নিপুণা,—নৃত্যগীতে-নিপুণা,—মধুর আলাপে নিপুণা;—ভিক্টোরিয়া মধুরভাষিণী,—মধুর-হাসিনী,—মরাল-গামিনী—শারদচন্দ্র-নিভাননী;—সেই ভিক্টোরিয়া,—যুবতী ভিক্টোরিয়া রাজ-রাজেশ্বরী হইয়াও, আজও বিবাহ করিলেন না কেন,—বিবাহের কোন উদ্‌যোগই করিতেছেন না কেন,—ইউরোপীয় কতকগুলি যুবকবৃন্দের ইহাই বিতর্কের বিষয় হইল। সেই স্বর্গধামের মহাসতী, কাহার গলে বর-মালা অর্পণ করিবেন,—ইহাই কতকগুলি উন্মত্ত যুবকের চিন্তার বিষয় হইল। নন্দন-কাননের এই মহা কুসুম, কাহার কণ্ঠে শোভমান হইবে, ইহাই ভাবিয়া-ভাবিয়া কেহ কেহ পাগল হইল। এই মহাপদ্মিনী কোন্ মধুকরের আশা-পথ চাহিয়া কুমারী-জীবন অতিবাহিত করিতেছেন, ইহা লইয়াই ইংলণ্ডের সৌখীন, সম্ভ্রান্ত যুবকদল মধ্যে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল। কেহ বলিলেন, "ভিক্টোরিয়া রমণী-শিরোমণি;—তিনি বিবাহের জন্য, সংসারের সুখ-বন্ধনের জন্য,—রাজা চান না,—রাজপুত্র চান না,—রাজবংশোদ্ভব কোনও পুরুষ চান না,—তিনি চাহেন কেবল পবিত্র প্রণয়। তিনি চাহেন—গুণবান্ স্বধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি। তিনি রূপের ভিখারিণী নন;—তিনি কেবল জ্ঞান-বুদ্ধিযুক্ত এবং সংস্বভাবান্বিত পুরুষের পাণিগ্রহণাভিলাষিণী। সত্য সত্যই এইরূপ নানা কথা ভাবিয়া-ভাবিয়া,—ইংলণ্ডের, জর্ম্মণীর, ফ্রান্সের অনেক যুবক রাত্রে নিদ্রা যান

নাই, উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিতে পারেন নাই,—এবং বিষয়কর্ম্মে সম্যক্‌-রূপ মনঃসংযোগ করিতে সক্ষম হন নাই। কোন এক যুবকের এমনি ধারণা জন্মিয়াছিল যে, তিনি স্থিরনিশ্চয় হইয়াছিলেন, ইংলণ্ডেশ্বরী তাঁহাকে বিবাহ করিবেনই করিবেন। সেই যুবক প্রত্যহ বৈকালে গাড়ী করিয়া মহারাণীর প্রমোদ-কাননে, মহারাণীকে দেখিবার জন্য এবং দেখা দিবার জন্য, আসিয়া উপনীত হইতেন। রাজ-বাটীর সংলগ্ন সেই নিকুঞ্জ-বনে, মহারাণী, আসিবা-মাত্র, সেই যুবক মহারাণীর পানে এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকিতেন ;—চক্ষের পলক ফেলিতেন কি না, সন্দেহ। প্রথমতঃ, মহারাণী এ বিষয়ের বিন্দুবিসর্গ বুঝিতে পারেন নাই। তিনি যদৃচ্ছাক্রমে এদিক-ওদিক চাহিতে চাহিতে হঠাৎ যদি একবার যুবকের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেন, তাহা হইলে যুবক ভাবিত,—এই দেখ, মহারাণী আমার প্রতি চাহিতেছেন! মহারাণী যদি আপন মনে যুবকের সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেলেন, যুবক ভাবিল, মহারাণী আমাকে প্রীতিসম্ভাষণ করিতে আসিতেছিলেন,—কিন্তু হায় রে! স্ত্রীজন-সুলভ লজ্জা বশতঃ তিনি কথা কহিতে পারিলেন না। ক্রমশঃ মাত্রাবৃদ্ধি হইল। মহারাণীর শকট রাজপথে বাহির হইবামাত্র, যুবকও সেই শকটের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আপন শকট চালাইয়া বেড়াইতে লাগিলেন। যখন মহারাণীর শকট ধীরে যায়, যুবকের শকট ধীরে চলে। মহারাণীর শকট দৌড়িলে, যুবকের শকট দৌড়িতে থাকে। কিছুকাল এই ভাবেই চলিল। ইংলণ্ডে হিমসাগর বা নারায়ণ তৈল থাকিলে, যুবককে বোধ হয়, এত কষ্ট পাইতে হইত না।

দেখিতে দেখিতে স্কটলণ্ড হইতে এক নবযুবক ইংলণ্ডের রাজভবনে আসিয়া পঁহুছিলেন। প্রস্তাব করিলেন, "আমিই মহারাণীর একমাত্র উপযুক্ত বর। কুলে, শীলে, গুণে, মানে আমি স্কটলণ্ড মধ্যে অদ্বিতীয় পুরুষ। আমার স্বভা-বের পরীক্ষা লউন, দেখিবেন, আমার ন্যায় সৎস্বভাবান্বিত পুরুষ পৃথিবীতে আর নাই। আমার বয়সও অল্প, রূপও নিতান্ত মন্দ নয়।" এই কথা শুনিয়া, রাজবাটীতে মহা কৌতুক-কলরব পড়িয়া গেল। মহারাণী হাসিতে

লাগিলেন। রাজ-চিকিৎসক আসিয়া যুবকের নাড়ী টিপিলেন। যুবকের সহিত নানারূপ কথাবার্ত্তা কহিয়া যুবকের পরীক্ষা লইলেন। বলিলেন, 'এ যে ঘোর উন্মত্ততা দেখিতেছি।' যুবক পাগলাগারদে প্রেরিত হইল।

আর একদিন মহারাণী ভজনালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া, পুরোহিত-মুখে ধর্ম্মকথা শ্রবণ করিতেছেন। মহারাণী যে আসনে উপবিষ্ট আছেন, ঠিক তাহার সম্মুখের আসনে একজন যুবক গিয়া বসিল। বসিয়া অবনত-বদনে মহারাণীকে অভিবাদন করিতে লাগিল। তখন মহারাণীর উদ্দেশে, বারংবার নিজেরই দক্ষিণ হস্ত চুম্বন করিতে লাগিল। এই উদ্ভট-ব্যাপার দেখিয়া, গির্জ্জাঘরে এক মহা হৈ হৈ শব্দ উঠিল। এই বিকট কাণ্ড অবলোকন করিয়া, মহারাণীও কিঞ্চিৎ বিব্রত হইলেন। তখন মহারাণীর প্রহরিগণ ঐ যুবককে ধরিল, বাঁধিল, এবং স্থানান্তরিত করিল। যুবক বলে, "আমাকে ধর কেন, বাঁধ কেন, লইয়া যাওইয়া বা কেন?—আমি যে মহারাণীর প্রণয়প্রার্থী হইয়া, বহুদূর হইতে দৌড়িয়া আসিয়াছি! আমার মুখ শুষ্ক হইয়াছে, তৃষ্ণায় বুকের ছাতি ফাটিতেছে, আমাকে জল দাও।" তখন তৃষ্ণার্ত্ত যুবককে অর্দ্ধচন্দ্রের সুধাদানে পরিতৃপ্ত করিয়া, প্রহরিগণ পুলিশের জেম্মায় রাখিয়া দিল।

এই সময় আরও বহু ব্যক্তি মহারাণীকে বহুসংখ্যক প্রণয়-পত্র লিখিয়াছিলেন।—"হা জীবিতেশ্বরি! আমি তোমা বৈ আর কাহাকেও জানি না—তুমিই আমার সর্ব্বস্ব। আমার পাণিপীড়ন করিলে তুমি সুখে কাল কাটাইবে। আমি রাজপুত্র নহি বটে; কিন্তু যদি গুণ চাও, সুখ চাও, সৎস্বভাব চাও,—তবে আমারই গলে বরমাল্য প্রদান কর।"

কয়েক খানি প্রণয়-পত্রের মর্ম্ম এইরূপ ছিল। দুই তিনখানি প্রণয়-পত্র, তৎকালে সংবাদ-পত্রে প্রকাশিতও হইয়াছিল।

১৮৩৯ খৃষ্টাব্দ,—বসন্ত-কাল। মনোহর বায়ু, মন্দ মন্দ বহিতেছে। শীতব্যাধি-প্রপীড়িত ইংলণ্ডের নর-নারীর মুখকমল আবার প্রস্ফুটিত হইয়াছে। অনূঢ়া যুবতী মহারাণী রাজকীয় শকটে, রাজপথে ভ্রমণার্থ বহির্গত হইয়াছেন;

লোকে লোকারণ্য। অনিমেষলোচনে দর্শকবৃন্দ,—সহচরী-পরিবৃতা মহারাণীর সেই অসীম রূপ-লাবণ্য—সেই প্রফুল্ল নবমল্লিকাফুলদলকে সন্দর্শন করিতেছে। এক হৃষ্ট-পুষ্ট-বলিষ্ঠ যুবক, শরীরের সামর্থ্যে,—সেই লোকারণ্যকে ভেদ করিয়া, মহারাণীর শকটের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল এবং একখণ্ড প্রণয়-পত্র সজোরে গাড়ীর ভিতর ফেলিয়া দিল। সেই "পবিত্র"—প্রণয়-পত্রের পতন কালে, মহারাণীর মুখে বিশেষ আঘাত লাগিয়াছিল। "কি হইল—কি হইল"—"মহারাণীকে কে মারিল,—কে মারিল"—তখন প্রহরিবৃন্দ এইরূপে এক মহা চীৎকার করিয়া উঠিল। কিন্তু দোষী ব্যক্তিকে কেহই খুঁজিয়া পাইল না। ক্রমশঃ গোলযোগ বাড়িতে লাগিল। মহারাণী আঘাতিত হইলেও, ধৈর্য্যচ্যুত হন নাই। তিনি ক্যোচম্যানকে গাড়ী থামাইতে আদেশ দিলেন। গাড়ী থামিল। মহারাণী তখন অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে সেই দুষ্ট যুবককে দেখাইয়া দিলেন; বলিলেন, "এই ব্যক্তিই পত্র নিক্ষেপ করিয়াছে।" বাঘ যেমন মেষ-শাবককে ধৃত করে, রাজপ্রহরিবৃন্দ অমনি সেই দুষ্ট ব্যক্তিকে গিয়া ধরিল। করুণাময়ী মহারাণী বলিলেন, "উহাকে প্রহার করিও না,—কেবল ধরিয়া রাখিয়া, দেখা যাউক, পত্রে কি লেখা আছে।" একজন সহচরী পত্র পাঠ করিয়া দেখিলেন, সেই প্রণয়েরই কথা,—মহারাণীকে পত্নীরূপে পাইবার কথা। আবার হাসির তরঙ্গ বহিয়া গেল। রাজচিকিৎসকের বিবেচনায় এই যুবকও বাতুল বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। সুতরাং বাতুলালয়ই তখন তাহার বাসগৃহ হইল।

আর একদিন আর একটী যুবক, মহারণীর রাজভবনের শয়নাগারে প্রবেশ করিয়াছিল। সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ ধৃত হয়। ধর্ম্মাধিকরণে তাহার বিচার হয়; এবং বিচারকের আদেশে সে ব্যক্তি দণ্ডিত হয়।

একদিন মহারণী হাইড্ পার্কের মাঠে ভ্রমণ করিতেছেন; সখীগণের সঙ্গে নানারূপ রহস্যালাপ করিতেছেন; এমন সময় এক যুবক মহারাণীর পার্শ্বে যাইবার নিমিত্ত চেষ্টা করিল।—'সকলে সর, তফাৎ হও, আমি মহারাণীর রাম

পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইব, আমি মহারাণীকে বিবাহ করিব।'—সে ব্যক্তিও প্রহরিগণ কর্ত্তৃক ধৃত এবং বিচারে দণ্ডিত হয়।

যৌবনের প্রারম্ভে এবং বিবাহ-বন্ধনের পূর্ব্বে মহারাণী এইরূপে অনেকবার উত্যক্ত হইয়াছিলেন।

'বিবাহ না হইলে মহারাণীকে আর ভাল দেখায় না,'—তখন লোকে এইরূপ কাণাকাণি করিতে লাগিল। মন্ত্রিবর্গ মহারাণীর বিবাহের নিমিত্ত চিন্তিত হইলেন। বর,—কে হইবেন? ইউরোপের পাঁচজন রাজপুত্র মন্ত্রিগণকর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইলেন। ইহাঁদের মধ্যে যাঁহাকে পছন্দ হইবে, ভিক্টোরিয়া তাঁহাকেই বিবাহ করিতে পারিবেন। ভিক্টোরিয়া কহিলেন, "এই পাঁচজন মধ্যে কেহই আমার বর নহেন,—আমার বর এক রকম নির্দ্দিষ্ট আছেন। আমি এখন মহারাণী, প্রাপ্তবয়স্কা এবং স্বাধীনা;—বর ইচ্ছামত পছন্দ করিয়া লইতে আমি এখন অধিকারী। আমার স্বামী হইবেন,—বোধ হয় আমার মামাত-ভাই—সেই প্রিন্স আলবার্ট। ভগবানের ইচ্ছায় বুঝি তিনি আমার পতি এবং আমি তাহার স্ত্রী। তবে উপস্থিত, আমি বিবাহ করিতে চাহি না,—আরও দুই বৎসর পরে আমি বিবাহ করিব, এরূপ স্থির করিয়াছি।"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

"প্রিয়তম আলবার্টকেই বিবাহ করিব; কিন্তু দুই বৎসর পরে বিবাহ করিব"—মহারাণীর এমন কথা বলিবার উদ্দেশ্য ছিল। যিনি মহারাণীর স্বামী হইবেন, তাঁহাকে কেবল প্রগাঢ় প্রণয়ী হইলেই চলিবে না, কেবল পূর্ণেন্দুবিকাশের ন্যায় অপরূপ রূপের ছটা ছড়াইয়া বেড়াইলেই চলিবে না,—মহারাণীর প্রণয়াধিকারী স্বামী হইতে হইলে অনেক দায়িত্বের বোঝা মাথায় করিয়া লইতে হইবে। পাকা রাজনীতিকের ন্যায় দশচাল ভাবিয়া কাজ করিতে হইবে।

পতি গৃহস্বামী; মহারাণীর পতি বিরাট বিশাল রাজসংসারের প্রভু হইয়া থাকিবেন; হাজার হাজার লোকের উপর নিত্য প্রভুত্ব চালাইতে হইবে; ইংলণ্ডের লর্ড-সংসারের ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে অষ্টপ্রহর ব্যবহার করিতে হইবে। বিংশতি বৎসর বয়ঃস্থ নবীন যুবক দ্বারা কি এই সকল কঠিন কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন হওয়া সম্ভব হইবে? আলবার্ট কচি-ছোকরা—অপেক্ষাকৃত দরিদ্রের ছেলে, একান্তে কলেজে কেবল লেখা-পড়াই শিখিয়াছে, কেবল দেশভ্রমণই করিয়াছে, আর নবোদ্গত যৌবনের নবীন রসপ্রবাহে যেন ডগমগ করিতেছে—এমন নবযুবক কি ইংলণ্ডেশ্বরীর গৃহস্বামী হইয়া সকল কার্য্য-পরিচালনভার নিজস্কন্ধে লইতে পারেন? মহারাণীর সেই সন্দেহই হইল। রূপবিমুগ্ধা যুবতী হইলেও ভিক্টোরিয়া কখনই কর্ত্তব্য-বিস্মৃত হইতেন না; বিচার বিবেচনা করিতে ক্ষান্ত থাকিতেন না।

আর এক কথা;—মহারাণী রাজ্যেশ্বরী, প্রজার দণ্ডমুণ্ডের বিধাত্রী; ইচ্ছাময়ী এবং শক্তিময়ী। কোন সংকুলজাত সু-শিক্ষিত প্রজা স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া এমন যুবতীরাজ্ঞীর কাছে প্রণয়কথা বলিতে পারে? আলবার্ট ইংলণ্ডের প্রজা বলিয়া স্বীকৃত না হইলে, ইংলণ্ডের আইনমত বিবাহ হওয়া সহজ হইত না। কারণ আলবার্টও একেবারে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র শাসনকর্ত্তা নহেন। তিনি মেজভাই—কোন কিছুরই মধ্যে নহে; কাজেই ইংলণ্ডের প্রজা-শ্রেণীভুক্ত হইয়া তাঁহাকে মহারাণীর পাণিগ্রহণ করিতে হইবে। জিজ্ঞাসা করি, প্রজা কি সাহসে বুক বাঁধিয়া রাজ্যেশ্বরীকে বলিতে পারে "প্রিয়ে, তোমায় আমি বড় ভালবাসি, আমার অঙ্কলক্ষ্মী হইয়া আমাকে কৃতার্থ করো।"

মহারাণীকে স্বয়ং সে বিষয়ের প্রস্তাব করিতে হইবে। কিন্তু মহারাণী হইলেও ত তাঁহার স্ত্রীত্ব ঘুচিয়া যায় না? যুবতী যুবজন-আরাধ্যা দেবী; যুবকই চটুল চাটুপটু বচনে যুবতীকে অধিকার করিবে; যুবকই প্রেমের কথা কহিয়া ব্রীড়াবনত মুখী যুবতীর চন্দ্রানন প্রেমোল্লাস-বিকশিত করিয়া কোকিল-ঝঙ্কার তুল্য কথা ফুটাইবে। ইষ্টদেবী কি পূজারির পূজার জন্মে অনুরোধ করিতে

পারেন; পূজারিই পূজা করিবে, স্তবস্তুতি পাঠ করিবে, প্রেমের অর্ঘ্য শ্রীচরণে দিবে। এক্ষেত্রে সবই উল্টা, শাস্ত্র উল্টা, স্বভাব উল্টা, ব্যবস্থা উল্টা। যুবতী হইলে কি হয়, মহারাণী ত শাসন-কর্ত্রী রাজ্যেশ্বরী! কাজেই তাঁহার মুখ আগে ফুটাইতে হইবে—প্রেমাস্পদ আলবার্টকে স্বয়ংই বলিতে হইবে, "ভাই, তোমাকে আমি ভালবাসি—তুমি অমার স্বামী—আমার হৃদয়েশ্বর হইবে কি?"

স্ত্রী-জনসুলভ লজ্জাবশতই ভিক্টোরিয়া আলবার্টের কাছে এ কথার প্রস্তাব করিতে পারিতেছিলেন না। হৃদয় বলাইতে চাহে, কিন্তু মুখ যেন কে চাপিয়া ধরে। এদিকে নবীন যুবক আল্‌বার্টও আর অপেক্ষা করিতে পারেন না। যখন তিনি শুনিলেন যে, মহারাণী ভিক্টোরিয়া আর দুই বৎসর বিবাহ কার্য্য স্থগিত রাখিতে চাহেন, তখন তিনি মনে ভাবিলেন—"ফাঁকি নহে ত; আমাকে আকাশপথে তৃষিত চাতকের ন্যায় ভাসাইয়া রাখিয়া নবনীরদ বারিদানে কি কার্পণ্য করিবে; আমার কি দুইদিকই নষ্ট হইবে না কি?" বাস্তবিকই আলবার্টের এ আশঙ্কা অমূলক নহে। একেত নবীন যুবক আগ্রহে সময়াপেক্ষা করিতে পারে না;—যে হৃদয়েশ্বরীয় হইবে, সে পূর্ণ যৌবনের ভার লইয়া চপলার ন্যায় চমকিয়া নাচিয়া ছুটিয়া বেড়াইবে, তিনি দূর হইতে দুই বৎসর কাল তাহাই দেখিবেন ও শুনিবেন—ইহা কি সহ্য হয়? তাহার উপর আলবার্ট দরিদ্র, তাঁহার নিজের রোজগার নিজে করিতে হইবে; যদি মহারাণী তাঁহাকে দুই বৎসর পরে কোন কারণে প্রত্যাখ্যান করেন; তখন উপায়? বয়স অধিক হইয়া গেলে নূতন ব্যবসায় শিক্ষা করা কঠিন হইয়া উঠিবে, অবস্থাযোগ্য উপার্জ্জনক্ষমতা হ্রাস হইবে। শেষে কি একটা রাণীর মোহে জীবনটাকে উষর মরুক্ষেত্র তুল্য করিয়া ফেলিব?—এই ভাবিয়া আলবার্ট জোর করিয়া বলিলেন যে, ১৮৩৯ শালের শরতের পরও যদি মহারাণী তাঁহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক না হন, তবে তিনি ভগিনী ভিক্টোরিয়ার সহিত প্রেমের সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করিবেন; স্বাধীন ভাবে অন্যত্র অন্যপ্রকার চেষ্টা করিবেন।

আলবার্টের এই প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া রাণীর উদ্বেগ হইল। যাহাকে সত্যসত্যই ভালবাসি, যাহার জন্যে সত্যসত্যই নিশিদিন প্রাণ কেমন করে, যাহার সুকুমার কান্তি দেখিয়া নয়ন-মন বিভোর হইয়া যায়, একবার মুখ ফুটিয়া মুখের কথা বলিলে যে চরণতলে গড়াইয়া পড়িবে, তাহাকে পাইবার পথে কি আর লজ্জার আগড় বাঁধিয়া দিয়া অপেক্ষা করিয়া থাকা চলে? প্রণয়ের কোটালে লজ্জার বালির বাঁধ ভাসিয়া গেল। ১৪ই অক্টোবর তারিখে মহারাণী লর্ড মেল্‌বোর্ণকে বলিলেন যে, তিনিও আর অপেক্ষা করিবেন না, সত্বরই আলবার্টকে মনের কথা কহিয়া, তাঁহার সম্মতি লইয়া পার্লমেণ্টে সচিব-সমিতির কাছে একথা জানাইবেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে প্রণয়ের কথা হইবার পূর্ব্বে একদিন উইণ্ডসর কাস্‌ল রাজভবনে বলনাচ হয়। সেই নাচের দিন মহারাণী আলবার্টকে একটা ছোট ফুলের তোড়া দিয়াছিলেন। আলবার্ট সেদিন প্রুষিয়ার সৈনিক-পরিচ্ছদে আবৃত ছিলেন। গলা পর্য্যন্ত বোতাম আঁটা কোট, এমন স্থান নাই যে, তোড়াটি গুঁজিয়া রাখেন! কিন্তু রসিক প্রণয়ী রসোদ্বেগে এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করিলেন—পকেট হইতে চাকুছুরি বাহির করিয়া ঠিক হৃদয়ের উপর কোটের কাপড় কাটিয়া ফুলের তোড়াটি বসাইয়া রাখিলেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে ১৫ই অক্টোবর তারিখে আলবার্ট যখন শীকার করিয়া সবেমাত্র ফিরিয়া আসিয়াছেন, তখন একজন আর্দ্দালি আসিয়া তাঁহাকে বলিয়া গেল যে, মহারাণীর হুকুম আপনি সত্বর তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করুন। আলবার্ট সেই পোষাকেই ত্বরান্বিত হইয়া রাণী-সকাসে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই গুপ্তগৃহে দুইজনে কি কথা হইল, প্রকাশ নাই; তবে এই ঘটনার পর

আলবার্ট যে পত্রখানি তাঁহার পিতামহীর কাছে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাহার কতকাংশ নিম্নে অনূদিত হইল।—

"রাণী আমাকে তাঁহার ঘরে একলা যাইবার জন্য ডাকাইয়া পাঠাইয়াছিলেন; আমি গিয়াছিলাম। তিনি প্রণয়োদ্বেগে আমাকে আগ্রহের সহিত বলিলেন, "তুমি যদি আমাকে পত্নীত্বে বরণ করিতে ইচ্ছা করো ত আমি কৃতার্থ হইব। আমাকে বিবাহ করিতে হইলে তোমাকে ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে। একেত আমি তোমার ন্যায় মন্মথ-পরাজয়ী নবীন যুবকের যোগ্যা নহি, তাহার উপর রাজ্যেশ্বরী হইয়া এমন অবস্থায় পড়িয়াছি যে, আমাকে বিবাহ করিতে হইলে অনেক রকমে, অনেক হিসাবে তোমাকে ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে। করিবে কি? এই সামান্যা কুমারীর জন্যে এতটা ক্ষতি স্বীকার করিবে কি? তোমার যোগ্য হইবার জন্যে আমি প্রাণপণ চেষ্টা করিব; তোমার মনোহরণ করিবার জন্যে আমি সদা চেষ্টিতা থাকিব—করিবে কি, আমাকে পত্নীত্বে বরণ?" রাণীর এই কথা শুনিয়া আমি আত্মহারা হইয়া গেলাম; কি বলিলাম, কি কহিলাম, কিছুই মনে নাই। আমরা এখন উভয়েই প্রণয়-বন্ধনে প্রকৃতরূপেই আবদ্ধ হইলাম।"

এই দিন প্রেমের যে হেম-শৃঙ্খলে এই যুবক-যুবতী আবদ্ধ হইলেন, যে সুখের সরোবরে উভয়ে একসঙ্গে ডুব দিলেন, তাহা যে ইংলণ্ডের পক্ষে কত সুখের কত আনন্দের হইয়াছিল, তাহা আমরা এখনও ঠিক বুঝিতে পারিব না। আমাদের পৌত্রগণ বুঝিতে পারিবে, এই দুইজনে যে ধর্ম্মের মহীরুহ রোপণ করিয়াছিলেন; তাহার শীতল ছায়ায় কত অগণিত নরনারী সুখে কালযাপন করিতেছে। দেশের শাসনকর্ত্তা কেবল শাসন করিয়াই ক্ষান্ত নহেন, তাঁহার ব্যবহারে সমাজের মতি-গতি পরিচালিত হইয়া থাকে, তাঁহার রুচিতে সমাজের রুচি পরিবর্ত্তিত হয়। ভিক্টোরিয়া এবং আলবার্ট ধর্ম্মের সংসার পাতাইয়া, সুনীতি এবং সুরুচির ভিত্তিতে রাজ-সংসার বসাইয়া ইংলণ্ডের যে উপকার করিয়াছেন, সমাজে যে পবিত্রতার নির্ম্মল নির্ঝরিণী

প্রবাহিতা করিয়া দিয়াছেন, তাহা বোধ হয় ইংলণ্ডের কোন কৃতী সন্তানই এতদূর এবং এতটা পারে নাই। আর কোন কারণে না হউক কেবল এই কারণেই এই রাজদম্পতী ইয়ুরোপের ইতিহাসে অমর পদলাভ করিবেন।

যাউক; দুইজনে এইরূপ মন খোলাখুলির পরে একসঙ্গে গীতবাদ্য হইত, ঠাট্টা তামাসা চলিত। পরে যথারীতি আলবার্ট এবং তাঁহার ভ্রাতা আরনেষ্ট একমাসের জন্যে লণ্ডন ত্যাগ করিয়া জর্ম্মণীতে চলিয়া গেলেন। ২৩শে অক্টোবর তারিখে বকিংহাম রাজপ্রাসাদে এক সচিব-সমিতী বসিল; মহারাণী উপস্থিত হইয়া ঘোষণাপত্র পাঠ করিলেন। নিজের বিবাহের ঘোষণাপত্র বিংশতি-বর্ষীয়া যুবতী পিতামহের আমলের বুড়া-বুড়া ঠাকুরদাদা সদৃশ মন্ত্রিগণের কাছে পাঠ করিতে লজ্জিত হইয়াছিলেন। পাঠকালে হাতের কাগজ খুব কাঁপিয়া-ছিল। ঘোষণাপত্রে তিনি বলিয়াছিলেন যে, আলবার্টের সহিত তাঁহার বিবাহ হইলে তাঁহার পক্ষে সুখকর হইবে, সুতরাং রাজ্যের পক্ষেও সুখকর হইবে।

এই ঘোষণা উপলক্ষে মহারাণী লণ্ডনের পতিতা দুঃখিনী কামিনীগণের সাহায্য নিমিত্তে পাঁচ শত টাকার অধিক দান করিয়াছিলেন।

ক্যাণ্টারবরীর আর্চ্চবিশপ বিবাহ-পদ্ধতি স্থির করিবার জন্যে একদিন মহারাণীর সন্নিধানে আসিলেন। তিনি মহারাণীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন যে, খৃষ্টীয় বিবাহ-পদ্ধতির এক স্থানে লেখা আছে যে, স্বামীর অনুগামিনী এবং আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া পত্নীকে থাকিতে হইবে। কিন্তু আলবার্টসম্প্রতি মহারাণীর সমক্ষে জানু পাতিয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন যে, তিনি মহারাণীর অধীন অনুগত প্রজা। প্রজাকে বিবাহ করিবার কালে রাজ্যেশ্বরীর পক্ষে কি বলা উচিত "তোমার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী সেবিকা হইয়া থাকিব।" উত্তরে আমাদের মহারাণী বলিলেন, "পুরোহিত মহাশয়, আমিত রাণী সাজিয়া বিবাহ করিতে যাইব না; আমি সামান্যা রমণীর ন্যায় পতিলাভে চরিতার্থা হইব। স্ত্রী চিরদিনই পতির আজ্ঞানুবর্ত্তিনী। স্ত্রী হইয়া স্বামীর কাছে কি আর রাণীগিরি করিব; যখন স্ত্রী তখন ত পতির সেবিকাই বটেই। আমার

অনুরোধ এবং আমার আজ্ঞা যে আপনি বিবাহ-পদ্ধতি আমার খাতিরে সংশোধন বা পরিবর্ত্তন করিবেন না। আমি অবলা, অবলার ন্যায়ই বিবাহ করিব। সকলে-সাধারণে ঠিক যে সকল কথা বলিয়া পবিত্র বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়, আমিও তাহাই বলিব, কিছুমাত্রও প্রভেদ হইবে না।"

মহারাণীর এই অপূর্ব্ব কথা শুনিয়া বৃদ্ধ আর্চ্চবিশপ অশ্রুপূর্ণ লোচনে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। জগজ্জয়ী ইংরেজ জাতির অধিশ্বরী মহারাণী শ্রীমতী ভিক্টোরিয়া সামান্যার ন্যায়ই বিবাহ করিলেন। এ দৃষ্টান্ত সকল রাজকুমারীর অনুকরণীয় নহে কি?

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

শুভদিন ১০ই ফেব্রুয়ারী ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে, মধ্যাহ্নকালে সেণ্টজেম্‌স রাজকীয় ধর্ম্মমন্দিরে মহারাণীর শুভপরিণয়কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছিল। সে উৎসবের ধূম-ধাম, সে আমোদ আহ্লাদ মনুষ্য-লেখনীর বর্ণনাযোগ্য নহে! স্বর্গরাজ্যে বসিয়া কল্পনার চক্ষে, স্নেহের হৃদয়ে তাহা দেখিতে হয়—সে সুখের দৃশ্য দেখাইবার যে নহে—দেখান যে যায় না! পিতৃহীনা অনাথিনী নবীনা যখন মাতৃ-সমভিব্যাহারিণী হইয়া শুষ্কমুখে, কাতরনয়নে ইতস্ততঃ দৃষ্টি বিক্ষেপ করিতে করিতে, প্রজাগণের উচ্চকণ্ঠনিনাদিত জয়ধ্বনিতে আত্মহারা হইয়া গির্জ্জা উদ্দেশ্যে যাইতেছিলেন; তখনকার সেই উদ্বেগ ক্লিষ্টমুখ, সেই ভাবনাভরা দেহ, সেই চকিত কম্পিত কমলনয়নযুগল কি মসিমুখী লেখনীর লিখনে চিত্রিত করা যায়! ব্রিটনেশ্বরীর বিবাহ যেমন করিয়া হইতে হয়, তেমনি ধূম ধামের সহিতই হইয়াছিল। পরন্তু ব্রিটনেশ্বরী হইয়াও সামান্যা রমণীর ন্যায় কেমনে ভিক্টোরিয়া বৈবাহিক মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন, কেমন করিয়া স্বামী মুখপানে চাহিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা দেখিবার ও দেখাইবার সামগ্রী।

মহারাণী ভিক্টোরিয়া বিবাহ-সাজে।

অঙ্গীকারের কিছু পূর্ব্বেই মহারাণী কিয়ৎক্ষণ শ্বেতপদ্মসদৃশ করযুগলের উপর ঈষদ্ রাগরঞ্জিত কমলমুখখানি ঢাকিয়া রাখিয়া ঈশ্বর উপাসনায় নিবিষ্ট রহিলেন। সেই স্থির-ধীর প্রেমের ছবি যেই দেখিয়াছে, সেই ভক্তিভারাবনত-মুখীর কাতর প্রার্থনার দৃষ্টি যেই লক্ষ্য করিয়াছে, সেই বুঝিয়াছে ভিক্টোরিয়া মানবী নহেন—,দেবী; মর্ত্তের রাণী নহেন, বৈকুণ্ঠবিলাসিনী শ্বেতপদ্মালয়া সারদা।

উপসনা শেষ হইল। সম্রাটের সম্রাট বিশ্বসম্রাটের আশীর্ব্বাদ পাইয়া, মহারাণী স্থিরমূর্ত্তিতে প্রধান পুরোহিতের নিকটবর্ত্তিনী হইলেন। পুরোহিত মহাশয় যথাশাস্ত্র উপদেশ দিতে লাগিলেন এবং "আলবার্ট ভিক্টোরিয়ার" নাম একত্র করিয়া আশীর্ব্বচন উচ্চারণ করিলেন।

শেষে কম্পিতকণ্ঠে পুরোহিত আর্ক বিশপ জিজ্ঞাসিলেন "ভিক্টোরিয়া তুমি কি আলবার্টকে তোমার বিবাহিত স্বামীপদে বরণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছ? তুমি কি ভগবানের ব্যবস্থানুযায়ী পবিত্র বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ থাকিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে চাহ? তুমি কি আলবার্টকে ভক্তি করিব? সম্মান করিবে? ভালবাসিবে? তাঁহার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া থাকিবে? রোগে শোকে তাঁহার সেবা করিবে? স্বাস্থ্যে-সুখে তাঁহার অনুগামিনী হইয়া থাকিবে? এবং যতদিন ইহজগতে দুইজনে জীবিত থাকিবে, ততদিন পবিত্র প্রেমের বন্ধনে বদ্ধ থাকিয়া দুই প্রাণে এক হইয়া থাকিবে?"

উত্তরে ভিক্টোরিয়া অকম্পিতকণ্ঠে বলিলেন,—"হাঁ আমি তাহাই করিব। "আলবার্টের আজ্ঞাকারিণী হইয়াই থাকিব।" এই কথাটী বলিবার সময়ে ভিক্টোরিয়া একবার বিলোল-কটাক্ষ-বিক্ষেপে আলবার্টকে সেই বিবাহস্থানেও চমকাইয়া দিয়াছিলেন। সেই কটাক্ষবিদ্যুচ্ছটা যে দেখিয়াছিল, সেই বুঝিয়াছিল যে, উভয়ে প্রগাঢ় প্রণয়ে আবদ্ধ রাজা-রাণীতে এমনতর হয় না।

আলবার্ট বিবাহের অঙ্গুরীয় কম্পিতকরে ভিক্টোরিয়ার চম্পক-অঙ্গুলিতে পরাইয়া দিলেন। আর অমনি চারিদিক হইতে কোটী কণ্ঠনিনাদিত জয়ধ্বনিতে

গৃহপ্রাঙ্গণ কাঁপিয়া উঠিল। তোপের শব্দ, ঘণ্টার শব্দ, বন্দুকের আওয়াজ—নানাশব্দে একটা কেমন এক কোলাহল হইয়া উঠিল।

ব্রিটনেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়া রাজকুমার আলবার্টকে শুভবিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া নিজপতিত্বে বরণ করিয়া, তাঁহার সেবিকা হইয়া রহিলেন।

কিন্তু এত সুখের বিবাহের "মধুচন্দ্র" একদিনের অধিক স্থায়ী রহিল না। বিলাতে যুবক যুবতী বিবাহের পর একান্তস্থানে কিছুদিনের জন্যে থাকিয়া নির্ব্বিবাদে প্রণয়সুধা পান করিয়া থাকেন। কিন্তু ভিক্টোরিয়া রাজ্যেশ্বরী; রাজ্যেশ্বরীর এমন সুখে ডুবিতে নাই, যাহাতে রাজ্যের কোন অমঙ্গল হইতে পারে, রাজকার্য্যে বাধাবিঘ্ন ঘটিতে পারে! কাজেই একদিন বৈ দুইজনে দুইদিনেও একান্তে থাকিতে পারিলেন না। কর্ত্তব্যের খাতিরে সুখের স্বর্গ ভুলিয়া সংসারে ফিরিয়া আসিলেন।

একোনবিংশ পরিচ্ছেদ।

শুভ বিবাহ ত যথারীতি হইয়া গেল। মহারাণী এবং আলবার্ট "মধুচন্দ্রের" আনন্দ উপভোগ করিয়া আবার রাজকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। আলবার্টের পক্ষে আর রাজকার্য্য কি;—তিনি ত কেবল মাত্র রাণীর ভর্ত্তা! বিলাতে তখন আর ত তাঁহার কোন পদ ছিল না! তথাপি বলিতে হয় কেবল "পতিগিরী" চাকুরীতে অনেক ফ্যাসাদ আছে। রাজকুমারের বিবাহের প্রথম বৎসরে তাঁহাকে এই সকল ফ্যাসাদ সহিতে হইয়াছিল। মহারাণী ভিক্টোরিয়া যেমন প্রেমময়ী, রসময়ী ছিলেন, তেমনি পতি-সোহাগিনী, পতি-পদ-সেবিকাও ছিলেন। ইংলণ্ডেশ্বরী—ভুবনেশ্বরী, তিনি, রাজকুমার আলবার্টকে পতিত্বে বরণ করিয়া যে কৃতার্থ করিয়াছিলেন,—এমন নীচভাব কখনও তাঁহার মনে উদয়ই হইত না। অন্যের কাছে যেমন রাণী হইয়া থাকিতে হয়, তেমনি রাণী

হইয়াই থাকিতেন; আলবার্টের কাছে তিনি আজ্ঞানুবর্ত্তিনী পত্নী হইয়া থাকিতেন। যখন উভয়ে গৃহ প্রবেশ করিলেন, তখন উইণ্ডসর রাজ-সংসারে রাজকুমারকে কেহ তেমন গ্রাহ্য করিত না। এমন কি লর্ড চেম্বরলেন—বা রাজবাটীর প্রধান কর্ম্মচারী, বড় বড় উৎসবের সময়ে একা মহারাণীর গাড়ীতে বসিয়া যাইবার ঝোঁক ধরিয়াছিলেন। তিনি বলেন যে, উৎসব কালে তিনিই মহারাণীর অনুচর—ছায়ার ন্যায় মহারাণীর অনুগমন করা তাঁহারই অধিকার।

এই সকল নানা কারণে অন্য বিষয়ে সুখী হইলেও মহারাণীর প্রণয়াস্পদ হইয়া চরিতার্থ হইলেও, আলবার্টের মনটা কেমন যেন ছোট হইয়া থাকিত। তিনি গৃহস্বামী; কিন্তু মহারাণী ব্যতীত তাঁহারই গৃহে, তাঁহাকে আর কেহ মানে না। ক্রমে এইকথা মহারাণীর কাণে উঠিল। তখন তিনি সকলকে ডাকাইয়া বলিয়া দিলেন যে 'দেখ, আমি রাজরাণী অধীশ্বরী হইলেও, এ গৃহে আমার স্বামীই গৃহস্বামী। এ গৃহে আমি রাজরাণী—রাজ্যেশ্বরী নহি; কেবল পত্নী মাত্র। আমার স্বামীই আমার এই রাজসংসারের স্বামী এবং প্রভু। আমি তাঁহার আজ্ঞাকারিণী হইব, অনুগতা থাকিব বলিয়া ঈশ্বরের মন্দিরে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। আমি তাঁহার সেবিকা; সুতরাং তোমরা আমার স্বামীর সেবিকার সেবিকা বা সেবক।" মহারাণীর এই অপূর্ব্ব বাণী শুনিয়া, সকলে বিস্মিতলোচনে রাজকুমারের প্রতি তাকাইয়া, তাঁহার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া, জানুপাতিয়া তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিলেন। রাজকুমার গৃহস্বামী হইলেন। তাঁহার সকল ক্ষোভের, সকল দুঃখের কারণ বিদূরিত হইল।

রাজকুমার আলবার্টের নিজের খরচ সংকুলন করিবার জন্যে পার্লামেণ্ট তাঁহাকে বাৎসরিক সাড়ে চারি লক্ষ টাকা দিতে স্বীকার হইয়াছিলেন। যত দিন তিনি জীবিত থাকিবেন, ততদিন এই টাকা পাইবেন।

যাউক, ঘরসংসার ঠিক হইয়া গেলে, যথারূপে গৃহস্বামী হইয়া অধিষ্ঠিত হইলে পর, আলবার্টের ভাই আরনেষ্ট তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন। বাল্যের সকল সঙ্গীই চলিয়া গেল; স্বজাতি, স্বদেশ তাঁহাকে

চিরদিনের জন্যে ত্যাগ করিতে হইল। তিনি ইংলণ্ডের রাণীর ভর্ত্তা হইয়া, ইংলণ্ডের কেনা হইয়া রহিলেন। এ বিচ্ছেদে তাঁহাকে অবসন্ন হইতে হইয়াছিল; তাঁহাকে মর্ম্মাহত হইতে হইয়াছিল। তবে ভিক্টোরিয়ার ন্যায় দেবী যাঁহার পত্নী, তিনি সহজে সকল ভুলিয়া থাকিতে পারেন; স্বদেশ এবং স্বজাতি ত্যাগ-জন্য যে ক্ষণেকের দুঃখ, তাহা তাঁহাকে ম্লান করিতে পারে না।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

নব পরিণীতার মান-অভিমান যেমন থাকিতে হয়, অবশ্য এই নব দম্পতির মধ্যে তাহা ছিল। যেমন গাঢ় আগ্রহ এবং আকাঙ্ক্ষা ছিল, তেমনি মাঝে মাঝে অভিমানও চপলাখেলার ন্যায় দেখা দিত। একদিন মহারাণীর কোন এক কথায় আলবার্ট রাগ করিয়া এক ঘরের দুয়ার বন্ধ করিয়া অভিমানে একলাটি শুইয়াছিলেন। মহারাণীও প্রথমে রাগের ভরে আলবার্টকে ধরিয়া বুঝাইয়া রাখিবার চেষ্টা করেন নাই। দুইজনের মনেই দুধ ওতলানর মত অভিমানটা বেশ ফুলিয়া, ফাঁপিয়া উঠিয়া ছিল। উভয়েই মনে মনে সংকল্প আঁটিলেন যে "না সাধিলে কথা কহিব না।" বেশ জমকাইয়া দাম্পত্য বিবাদটা লাগিয়া গেল; কিন্তু দণ্ডেক কাল পরে মহারাণী আলবার্টকে না দেখিয়া অস্থির হইলেন। কি করেন, ধীর-মন্থর গতিতে, যে ঘরে আলবার্ট স্বেচ্ছায় কয়েদী হইয়াছিলেন, সেই ঘরের দরজার নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। চম্পক অঙ্গুলি দ্বারা ধীরে ধীরে দরজার উপর দুইটা টোকা মারিলেন;—কোন সাড়া নাই! ধাক্কা দিলেন;—কোন শব্দ নাই! "আলবার্ট দুয়ার খোল,"—এ মধুর আহ্বানে কেহ উত্তর দিল না "আর এমন কথা বলিব না,—দুয়ার খোল", এ আদরের ডাকে কেহ নড়িল না! তখন রাজরাণী রাজ্যেশ্বরীর ন্যায় দৃঢ় কণ্ঠস্বরে ডাকিলেন —"আলবার্ট, তোমার অধীশ্বরী তোমাকে ডাকিতেছেন; তাঁহার আদেশে

প্রিন্স আলবার্ট।

তুমি দ্বার শীঘ্র খুলিবে।" এই হুকুম শুনিয়া আলবার্ট দ্বার খুলিয়া মহারাণীর সমক্ষে সামান্য প্রজার ন্যায় নতজানু হইয়া, করযোড়ে তাঁহার অভিলাষ জিজ্ঞাসা করিয়া মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন। যেন কত নম্র, আজ্ঞাকারী ভৃত্য,—কেমন রাজভক্ত সভ্য অধীন প্রজা! ধীরে ধীরে আলবার্ট আবার কহিলেন—"রাণীর কি আদেশ, দাস উপস্থিত।" আলবার্ট চরণ ধরিয়াছিলেন কি না, তাহা আমরা জানি না। নূতন প্রীতির এমন নিত্য নূতন অনেক রসের খেলা হইত।

একদিন উভয়ে লণ্ডন নগরে বেড়াইতে যাইতেছেন, পথে অক্সফোর্ড নামক এক সপ্তদশবর্ষীয় বালক মহারাণীকে লক্ষ্য করিয়া পিস্তল ছোড়ে। ভগবানের কৃপায় গুলি মহারাণীর অঙ্গ স্পর্শ করে নাই। এই অক্সফোর্ড পরে বিচারে পাগল বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর জেলে থাকিবার পর ইহাকে অষ্ট্রেলিয়ায় পাঠাইয়া দেওয়া হয়। সে তথায় ঘররঙ্গ করিয়া আহারাচ্ছাদন উপার্জ্জন করিত। মহারাণী দয়া করিয়া ইহার জীবন দান করিয়াছিলেন।

নবেম্বর মাসের মাঝা-মাঝি মহারাণী উইন্তসর প্রাসাদ হইতে লণ্ডনে আসিলেন। তিনি গুর্ব্বিণী ছিলেন। প্রসূতি কাল আসন্ন হইয়াছিল। প্রথম প্রসব, কাজেই বিশেষ সাবধানে সকল ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ২১শে নবেম্বর তারিখে তাঁহার মাতৃবেদনা উপস্থিত হইল। রাজ্যের সকল বড় বড় ডাক্তার, রাজকুমার আলবার্ট এবং ধাত্রী শ্রীমতী লিলী প্রসবাগারে উপস্থিত ছিলেন। কি হয়, কি হয় করিয়া সকলেই আশঙ্কায় এবং আতঙ্কে ব্যথিত ছিলেন। রাজ্যেশ্বরী হইলেও, মা হইবার যে বেদনা, তাহাত ভুগিতে হইবে! যাহা হউক, অপরাহ্ণ একটা চল্লিশ মিনিটের সময়ে মহারাণীর বড় মেয়ে—বর্ত্তমান জর্ম্মনসম্রাটের মাতা, সম্রাট ফ্রেডরিকের পত্নী—রাজকুমারী ভিক্টোরিয়া ভূমিষ্ঠা হইলেন। পার্শ্বের কক্ষে রাজ্যের সকল প্রধান কর্ম্মচারী এবং রাজনীতিকগণ উপস্থিত ছিলেন; ধাত্রী লিলী সদ্যপ্রসূতা রাজকুমারীকে ক্রোড়ে করিয়া এই সকল রাজপুরুষের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রধান

পুরোহিত আশীর্ব্বাদ করিবার মানসে মেয়েটিকে টেবিলের উপর রাখিতে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু নবাগতা কাঁদিয়া উঠিল। তখন ধাত্রী তাহাকে কোলে করিয়া জীবনের প্রথম বস্ত্র পরাইতে লইয়া গেলেন। প্রথম মেয়ে হওয়াতে রাজকুমার আলবার্টের একটু মনক্ষুন্নতা হইয়াছিল। তিনি ভাবিয়াছিলেন, হয়ত লোকেও—প্রজাবর্গও একটু নৈরাশ্যের ভাব দেখাইবে। আলবার্টের এই ক্ষোভের কথা শুনিয়া মহারাণী বলিয়াছিলেন, "ভাবনা কি? এইবার ছেলে প্রসব করিব।" বহুপুত্র কন্যার মাতা হইবার সাধটা মহারাণীর সেই যৌবন কাল হইতেই ছিল। ভগবান এ সাধ পূর্ণ করিতে কার্পণ্য করেন নাই।

প্রসূতি হইয়া যে কয়দিন মহারাণী আঁতুড় ঘরে আবদ্ধ ছিলেন, সেই কয়-দিন আলবার্ট অহরহ তাঁহার কাছে বসিয়া থাকিতেন, পুস্তক পাঠ করিতেন, তাঁহার হইয়া পত্রাদি লিখিতেন এবং ঘরে অধিক আলো আসিলে, তাহা কম করিয়া দিতেন। বিছানা হইতে উঠিয়া সোফায় শুইতে চাহিলে, আল-বার্ট ধীরে ধীরে তাঁহাকে কোলে করিয়া তুলিয়া সোফায় শোয়াইয়া দিতেন। কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে লইয়া যাইতে হইলে আলবার্টই ধীরে ধীরে চাকাওয়ালা বিছানার উপর রাখিয়া মহারাণীকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতেন। বাটীর যেখানেই থাকুন না কেন, একবার সাড়া পাইলে আলবার্ট মহারাণীর কাছে আসিয়া হাজির হইতেন। আলবার্টের সেবা, আলবার্টের যত্ন, আলবার্টের শুশ্রূষার কথা সকলের মুখে মুখে ঘুরিতে লাগিল। মাও বোধ হয় আদরিণী কন্যার এত যত্ন করিতে পারেন না, পুরুষ স্বামী হইয়া আলবার্ট মহারাণীর যেমন সেবা করিয়াছিলেন।

মহারাণীর অসুস্থাবস্থায় আলবার্টই সকল পত্রাদি লিখিতেন এবং রাজ-পুরুষগণের সহিত রাজকীয় কথাবার্ত্তা কহিতেন। আলবার্ট মহারাণীর স্বামী পাকা মন্ত্রিরূপে অহরহ তাঁহার পার্শ্বেই থাকিতেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

শীতকালে বিলাতে নদী এবং পুষ্করিণী আদির জল জমিয়া বরফ হইয়া এত কঠিন হয় যে, অনায়াসে তাহার উপর দিয়া চলাফেরা করা চলে। চিক্কণ, মসৃণ বরফের উপর সাহেবেরা এক প্রকার খড়ম পায়ে দিয়া, ঘুরিয়া বেড়ান। এই পাদুকাকে "স্কেট" বলে। ইহা পায়ে দিয়া বরফের উপর খুব দ্রুতগতিতে যাওয়া যায়; মনে হয় যেন পিছলিয়া যাইতেছি, যেন তীব্রবেগে ভাসিয়া যাইতেছি। এই প্রকার দ্রুতগমনে বড়ই উৎফুল্লতা হয়, তাই শীতকালে বিলাতের সকল ভদ্রলোকে "স্কেট" করিয়া দৌড়িয়া বেড়ান।

একদিন রাজকুমার আলবার্ট মহারাণীর সমক্ষে এই প্রকার "স্কেট" করিয়া বেড়াইতেছেন;—খুব দ্রুতগতিতে যেন দেবতার ন্যায় ভাসিয়া যাইতেছেন, মহারাণী তাহা অনিমেষ নয়নে দেখিতেছেন এবং প্রিয়তমের রূপের ও গুণের প্রশংসা করিতেছেন; এমন সময়ে হঠাৎ এক স্থানের এক চাপ বরফ ভাঙ্গিয়া আলবার্ট জলে পড়িয়া গেলেন। "গেল গেল" বলিয়া একটা শব্দ উঠিল। মহারাণীর সঙ্গিনী কাঁদিয়া ফেলিলেন; কিন্তু ভিক্টোরিয়া স্থির ভাবে, সাহসে ভর করিয়া, সেই ভাঙ্গা বরফের ধারে দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে আলবার্টকে হাত ধরিয়া তুলিলেন। আলবার্ট উপরে আসিয়া যখন দাঁড়াইলেন, তখন তিনি আর থাকিতে পারিলেন না, কাঁদিয়া ফেলিলেন। দুই জনে হাসিতে-কাঁদিতে ভিজাকাপড়ে প্রাসাদে গিয়া তবে স্থির হন।

পর বৎসর ১৮৪১ সাল, ৯ই নবেম্বর তারিখে মহারাণী একটি নবকুমার প্রসব করিলেন। রাজ্যাধিকারী রাজকুমার ভূমিষ্ঠ হইলেন, এই সমাচার লণ্ডন নগরে প্রচারিত হইতেই, আনন্দের এমন একটা কল্লোল-কোলাহল উঠিল যে, তাহা শুনিয়া মনে হইল আকাশমেদিনী বুঝিবা আমোদে ফাটিয়া যায়। ঘন ঘন তোপ ধ্বনি, ঘন ঘন অগণিত গির্জ্জাচূড়া হইতে আনন্দ-ঘণ্টা-ধ্বনি, অশ্বের হ্রেষা, তূর্য্যনিনাদ, অস্ত্রের ঝনঝনা, আর লোক সাধারণের জয় শব্দে

যেন আকাশ আলোড়িত হইয়া গেল। সকলের মুখেই হাসি, সকলই চক্ষেই আনন্দজ্যোতি যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে। এমন আনন্দের দিন ইংলণ্ডের বুঝি ইতিপূর্ব্বে আর হয় নাই! চতুর্থ জর্জ্জ অপুত্রক মরিয়াছিলেন, চতুর্থ উইলিয়মও অপুত্রক দেহত্যাগ করিয়াছিলেন; রাজকুমারী রাজ্যাধিকারী যুবরাজের জন্মোৎসব বহুদিন ইংলণ্ডে হয় নাই। তাই সেই ৯ই নবেম্বর শুভদিনে রাজকুমারের জন্মকথা শুনিয়া ইংরেজ আনন্দে ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল।

প্রসবক্লেশ তিরোহিত হইলে, মহারাণী সুস্থ হইলেন; যখন মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিলেন, তখন প্রাণপ্রিয় আলবার্টের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তিনি মৃদু হাসিয়া বলিলেন "আলবার্ট, এই তোমার কুমার কোলে লও; আজ আমার জন্ম সার্থক; আমি পুত্রবতী হইলাম, রাজার মা হইলাম! আমার পুত্রকে আশীর্ব্বাদ কর! প্রিয়তম, আমি রাজ্যেশ্বরী অপেক্ষা, রাজমাতা হইতে বড় ভালবাসি। বলিয়াছিলাম, তোমার কোলে পুত্র দিয়া কৃতার্থ হইব; আজ আমার সে সাধ পূর্ণ হইল। ভগবান আমাদের সুখে রাখুন।"

সুখে থাক মা, তুমি রাজার মা, সম্রাটের মা, আর দীনদুঃখি আমাদেরও মা! তুমি জগজ্জননী স্নেহময়ী হইয়া সুখে থাক! তোমার সকল পুত্র কন্যা সুখে থাকুক!

এইবার মাহারাণীকে সবল সুস্থ হইতে সময় লাগিয়াছিল। মাতৃবেদানাও বড় তীব্র হইয়াছিল। যে কয়দিন ভিক্টোরিয়া কক্ষে আবদ্ধ ছিলেন, সে কয়দিন ছায়ার ন্যায় আলবার্ট তাঁহার কাছে থাকিতেন এবং সেবা করিতেন। ছোট-মেয়ে, "ভিকি" মায়ের বিছানায় বসিয়া গোল গোল মাখনের হাত দুখানি নাড়িয়া নবাগত ছোটভাইটির সহিত অস্ফুট ভাষায় কত কথা কহিত। দুইজনে মাঝে মাঝে হাসিয়া ঘর মাতাইয়া দিত। শিশুর হাসি যে গৃহে নাই, সে গৃহ গৃহই নহে।

ছেলেটি কাহার মতন হইবে, মহারাণীর এখন এই ভাবনাই হইল। খুল্লতাত বেলজিয়মরাজ লিওপোল্ডকে পত্র লিখিবার সময়ে মহারাণী লিখিয়াছিলেন,—

"খুড়ামহাশয়, আমার ছেলে হইয়াছে। শুনিয়া তুমি নিশ্চয়ই সুখী হইবে। আমার বড় সাধ ছেলেটি তাহার পিতার মত রূপেগুণে উত্তম হয়। আমার পুত্র প্রিয়তম আলবার্টের অনুরূপ হইবে, ইহাই আমার একমাত্র সাধ।"

নবপ্রসূত যুবরাজের নামকরণ ব্যাপার খুব ধুম-ধামের সহিত হইয়াছিল। প্রুসিয়ার রাজা এই উৎসবে স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ২৫শে জানুয়ারী ১৮৪২সালে যুবরাজের নামকরণ হইলে। ইংলণ্ডের প্রধান পুরোহিত আরর্ক বিসপ ক্যাণ্টরবরি শিশুকে কোলে করিয়া খৃষ্ট ধর্ম্মের ব্যবস্থানুযায়ী উহাকে আশীর্ব্বাদ এবং অভিষেক করিয়া নামকরণ করিলেন। নাম হইল, যুবরাজ আলবার্ট এডওয়ার্ড প্রিন্স অব ওয়েলসে।

এই সময়ে পার্লামেণ্টে স্থির হইল যে, ভগবান না করুন, যদি মহারাণীর দেহান্তর হয়ত, প্রিন্স আলবার্টই তাঁহার পুত্র যুবরাজ আলবার্টের অভিভাবক স্বরূপ থাকিবেন। ইংলণ্ডের লোক যে এতদিন পরে প্রিন্স আলবার্টকে শ্রদ্ধা এবং ভক্তি করিতে শিখিয়াছে, এই ঘটনার দ্বারা তাহাই স্পষ্ট বুঝা গেল। কেন না, ইংলণ্ডের রাজ্যাধিকারী যুবরাজের শিক্ষা ও ভরণপোষণ বিষয়ে ইংলণ্ডবাসিগণই দায়ী। ইংলণ্ডের প্রজা চাহে যে, দেশের রাজা ইংরেজ হউন, শিক্ষায় ও ধারণায় পূরা ইংরেজই হউন। এলবার্ট বিদেশী,—জর্ম্মণ; তিনি "রাজার বাপ" হইলেও রাজামুকুটে তাঁহার কোন অধিকার নাই। মহারাণীর পতি বলিয়াই তাঁহার যাকিছু পদমর্য্যাদাছিল। এখন তিনি পার্লমেণ্টে কর্ত্তৃক যুবরাজের অভিভাবক এবং রাজ্যের রক্ষক নিযুক্ত হওয়াতে, সকলেই বুঝিল ইংলণ্ডবাসী প্রিন্সকে বিশ্বাস করিতে শিখিয়াছে।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

এতক্ষণ আমরা মহারাণীর কেবল গার্হস্থ্য জীবনের কথা বলিলাম। গৃহে তিনি যে দেবী ছিলেন, তাহা বোধ হয়, সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন। মহারাণী হইলেও কেমন করিয়া ভাল বাসিতে হয়, পত্নী হইয়া পতিসোহাগিনী হইতে হয়, গৃহিণী হইয়া পতির মর্য্যাদা রাখিতে হয়, তাহা ভিক্টোরিয়া খুব ভালই জানিতেন। তাঁহার পবিত্র জীবনের গুণে ইংলণ্ডের রাজসংসার পবিত্র হইয়া গিয়াছে। যেখানে অধর্ম্ম ছিল, সেইখানে ধর্ম্মের পবিত্র আসন পাতা হইয়াছে। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ন্যায় স্বর্গেরদেবী ব্রিটিশ সিংহাসন-অধিষ্ঠাত্রী, তাই আজ ব্রিটনবাসী জগতে পূজ্য, সর্ব্বজন মান্য। পরন্তু কেবল গৃহের কথা কহিলে রাজ্যেশ্বরীর জীবনী সম্পূর্ণ হয় না। রাজ্যের কথা, রাজ্যশাসন শৃঙ্খলার কথাও কহিতে হইবে। এইবার তাহারই আলোচনা করা যাউক।

ইংলণ্ডের অধীশ্বর স্বেচ্ছাচারী হইতে পারেন না। প্রজার তিনি দণ্ড-মুণ্ডের কর্ত্তা নহেন। তাঁহার ক্ষমতা খুব সীমাবদ্ধ। রাজা হইলেও হত্যাপরাধে তাঁহাকে দায়ী হইতে হইবে; রাজা হইলেও বিনাপরাধে তিনি কোন প্রজাকে আবদ্ধ রাখিতে পারেন না; রাজা হইলেও, বিচারালয়ের যথারীতি বিচার না হইলে তিনি কোন প্রজাকে শাসন করিতে পারেন না; রাজা হইলেও তিনি যথেচ্ছ রাজকোষ হইতে অর্থব্যয় করিতে পারেন না; রাজা হইলেও তিনি যথেচ্ছ কোন রাজার সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইতে পারেন না। অন্য সাধারণ প্রজা যেমন আইন-কানুনদ্বারা আবদ্ধ এবং সংযত, ইংলণ্ডেশ্বরও তেমনি আইন-কানুনদ্বারা সংযত ও সংবদ্ধ।

ইংলণ্ডের রাজশক্তি ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির উপর ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ন্যস্ত আছে। একজনের কাছে সকল শক্তিই সংন্যস্ত নাই। শাসনশক্তি প্রয়োগে একের অধিকার অপরের ক্ষমতার কথঞ্চিৎ হ্রাস করিয়া থাকে। এক অপরের প্রতিরোধক হইয়া থাকে; এতদ্দ্বারা কোন শক্তিশালীই যথেচ্ছাচারী দুর্দ্দান্ত দুষ্ট হইতে পারে না।

শাসন-ব্যবস্থার উপরে রাজাত আছেনই; তাঁহার পর দুইটি পার্লামেণ্ট বা পঞ্চায়ত সভা। একটি সভাতে কেবল "রৈস্" বা দেশের শ্রেষ্ঠ উপাধিধারী জমিদার, বড় বড় রাজ-পুরোহিত বা বিশপ এবং প্রখ্যাতবান্ আইনজ্ঞ বিচারক সকল সদস্যরূপে বসিয়া থাকেন। এই সভাকে "হাউস অব-লর্ডস" বলে। এই সভার সদস্য হইতে হইলে ভোটের হাঙ্গামায় যাইতে হয় না। বনিয়াদী জমিদারের জ্যেষ্ঠ পুত্র হইলে, উত্তরাধিকারী সত্ত্বে এই সভার সদস্য হইতে পারা যায়; বিচারপতি নিযুক্ত হইয়া লর্ড উপাধি পাইলে, সদস্য হইতে পারা যায়; প্রধান পুরোহিত বা "বিশপ" হইলে সদস্য হইতে পারা যায়। এই সভাতে কেবল বড়লোকের ছেলে, পণ্ডিত বিচারক আদি বসিতে পারেন। হাঁউস অব লর্ডসের আইন করিবার, আইন খারিজ করিবার, এবং বিচার করিবার ক্ষমতা আছে।

দ্বিতীয় সভাকে সাধারণ সভা বা "হাউস্ অব কমন্স" কহে। এই সভায় যাঁহারা ভোট দ্বারা মনোনীত হন, তাঁহারাই সদস্যরূপে বসিতে পারেন। বার্ষিক আয়, শিক্ষা এবং গৃহাধিকার, এই তিন বিষয়ের বিবেচনা বিচার করিয়া অধিবাসিগণকে ভোটাধিকার দেওয়া হয়। কাহারও তিনটা, কাহারও পাঁচটা, কাহারও দুইটা ভোট থাকে। যে সকল মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকে সাধারণ সভায় সদস্য নিযুক্ত হইতে অভিলাষী হন, তাঁহাদিগকে "ভোটভিক্ষা" করিতে হয়। কত বক্তৃতা করিতে হয়, কত প্রকারের প্রতিজ্ঞা করিতে হয়, সাধারণ লোক সকলকে কত স্তোকবাক্যে তুষ্ট করিয়া কার্য্যোদ্ধার করিতে হয়। এই কমন্সসভায় প্রায় ৬২৫ জন সদস্য নিযুক্ত থাকেন। অর্থাৎ ইংলণ্ড, ওয়েলস্, স্কটলণ্ড এবং আয়রলণ্ড এই কয় স্থান প্রায় ৬২৫ টা বিভাগে বিভক্ত আছে। প্রত্যেক বিভাগ হইতে একজন করিয়া সদস্য মনোনীত হইয়া থাকে। অধিবাসীর সংখ্যা এবং অর্থোপার্জ্জন শক্তিবিচার করিয়া বিভাগ নির্দ্দিষ্ট হয়। এমন কি, একটা নগরকে চারি পাঁচটা বিভাগে বিভক্ত করা হয়। এই ৬২৫ জন সভ্যের উপর একজন সভাধিপতি আছেন, তাঁহাকে

"স্পিকার" বলা হয়। একজন সহকারী সভাপতিও আছেন; যখন "স্পিকার" অনুপস্থিত হন, তখন ইনি অধিনায়ক হইয়া বসেন; এবং কোন আইনের খসড়া বিচার জন্যে ছোট খাসসভা হইলে (যাহাকে "কমিটী" বলে) সহকারী মহাশয় তাহারই অধিনেতৃত্ব করেন।

এই দুই সভায়—হাউস্ অব্ "লর্ডস" এবং হাউস্ অব্ কমন্সে দুইটা দল আছে। একটাকে "হুইগ" বা "লিবারেল"; এবং অপরটীকে "টোরী" বা "কনসর-ভেটিব" বলা হয়। আমাদের বাঙ্গালায় ভাষান্তরিত করিলে "উন্নতি-শীল" ও "স্থিতিশীল" নাম দেওয়া চলে। যখন যে দলে লোক অধিক, তখন সেই দলের প্রাধান্য হইয়া থাকে। ব্রিটন রাজ্যের প্রায় অনেক প্রজাই ধরিতে গেলে, এই দুই দলে বিভক্ত। যাহা হউক, যে দল সংখ্যায় অধিক হয় তাহারই প্রাধান্য হয়। সেই দলের প্রধানেরা রাজমন্ত্রী নিযুক্ত হইয়া থাকেন। তাঁহারাই রাজকার্য্য পরিচালন করিয়া থাকেন।

রাজার ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক, যাঁহাদের দল পুষ্ট, তাঁহাদেরই রাজমন্ত্রীর পদ দিতে হইবে। রাজমন্ত্রীর পদ পান না, তাঁহারা যাঁহাদের দল সংখ্যায় ছোট থাকে। তাঁহারা কেবল বিপক্ষতাচরণ করিবার জন্যে বসিয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে "বিপক্ষ" বলিয়া পরিচিত করা হয়। এই বিপক্ষগণের সদাই চেষ্টা থাকে, কিসে বড় দলকে অপমানিত এবং লজ্জিত করি, কিসে উহাঁদের শাসন-শৃঙ্খলায় ভুল দেখাইয়া, পরাজিত করিয়া, নিজেরা বড় হই। এই দলাদলি ঈর্ষ্যাঈর্ষির ভাবে আইনকানুন আলোচিত হইলে দোষশূন্য হইবার সম্ভাবনা; তাই এই প্রথা ইংলণ্ডে প্রচলিত আছে।

কোন সভায় কোন কথার আলোচনা হইতে হইতে যদি প্রধান দল যুক্তিতে হটিয়া গেল এবং ভোটে পরাস্ত হইল, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সেই পরাজিত দলের প্রধানগণকে রাজমন্ত্রিত্বপদ ত্যাগ করিতে হইবে। রাজার ইচ্ছা না থাকিলেও এমন পরাজিত মন্ত্রিগণের পদত্যাগপত্র স্বীকার করিতে হইবে। অথবা সভায় পরাজিত দল, সাধারণ সভা ভঙ্গ করিয়া, তাহার

পুন বাছাইয়ের জন্যে দেশের লোকের নিকট আবেদন করিতে পারেন। সাধারণত সাত বৎসর অন্তর এক একবার করিয়া সাধারণ সভার সদস্য বাছাই হইয়া থাকে। কিন্তু মন্ত্রিদল এই প্রকারে কোন বিষয়ে হারিলে, যখন তখন সভা ভঙ্গ করিয়া দিতে পারেন।

হাউস্ অব্ কমন্সে "স্পিকার" মহাশয়ত সভাপতি থাকেনই, আবার মন্ত্রিদল হইতে একজন সাধারণ সভার প্রধান বা—"লিডার" বলিয়া অভিহিত হন। ইনি সভার সকল নূতন আইনের খসড়ার কথা বিচার বিবেচনা করিবার ব্যবস্থা করিতে পারেন। সাধারণ সভায় রাজ্যের আয় ব্যয় বিষয় বিচার হইয়া থাকে। সাধারণ সভার সদস্যগণই রাজকোষের অধিকারী।

কোন নূতন আইন করিতে হইলে, হয় তাহা প্রথমে সাধারণ সভায় বা লর্ড সভায় পেস করিতে হইবে। সেই সভা সদস্যগণকর্ত্তৃক আইনের সম্যক্ আলোচনা হইলে, অন্য সভার বিবেচনার জন্যে আইনের খসড়া তথায় পাঠাইয়া দেওয়া হয়। অপর সভা তাহার বিচার বিবেচনা করিয়া, আবশ্যক পরিবর্ত্তন করিয়া, রাজার অনুমতির জন্যে পাঠাইয়া দিবেন। রাজা ইচ্ছা করিলে কিছু দিনের জন্যে আইনে সম্মতি প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারেন।

যাহা হউক, মোটামুটি এই হিসাবেই ইংলণ্ডের রাজ্য শাসন হইয়া থাকে।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

যখন মহারাণী ভিক্টোরিয়া ইংলণ্ডের রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করিলেন, তখন মহামন্ত্রী ছিলেন, হুইগ দলের শ্রেষ্ঠ লর্ড মেলবোর্ণ।

লর্ড মেলবোর্ণের শিক্ষাধীন থাকিয়া মহারাণী রাজকার্য্য পরিচালন-শৃঙ্খলা শিখিয়াছিলেন। যখন যিনি প্রধান মন্ত্রী থাকেন, তখন তাঁহার আত্মীয়-বন্ধু

অনুগত ব্যক্তিগণই অন্যান্য সহযোগী-মন্ত্রিত্বের ভার লইয়া থাকেন। লর্ড মেলবোর্ণ উন্নতিশীল দলের অধিনায়ক, কাজেই তাঁহারই পারিপার্শ্বিক সকলেই মহারাণীর সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। বালিকা মহারাণী ইহাঁদেরই অনুগত থাকিয়া রাণীগিরি কার্য্যে পটুতা লাভ করিয়াছিলেন। বিলাতের প্রধান মন্ত্রীর এত ক্ষমতা যে, মহারাণীর চাকর-চাকরাণীর মধ্যে প্রধান কর্ম্মচারিগণও তাঁহারই মনোনীত হইতে হইবে।

১৮৩৭ সাল হইতে ১৮৪১ সাল পর্য্যন্ত লর্ড মেলবোর্ণ প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। অপর পক্ষের—কনসেরভেটিব পক্ষের নেতা সাররবার্ট পীল এতদিন লর্ড মেলবোর্ণের কেবল বিপক্ষতাচরণই করিয়া আসিতেছিলেন, কোন কার্য্যেই তাঁহাকে হটাইতে পারেন নাই। কিন্তু শেষে একদিন তিনি সাধারণ পার্লামেণ্ট গৃহে লর্ড মেলবোর্ণের শাসন-ব্যবস্থায় দোষ দেখাইয়া তাঁহাকে পরাজিত করেন। লর্ড মেলবোর্ণ পার্লামেণ্ট ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন পার্লামেণ্ট আহ্বান করিবার বন্দবস্ত করিলেন। কিন্তু নূতন পার্লামেণ্টে পীল সাহেবের দলই অধিক হইল। ফলে লর্ড মেলবোর্ণকে পদত্যাগ করিতে হইল।

মহারাণীর পক্ষে এ বিচ্ছেদ একটু কষ্টকর হইয়াছিল। প্রথম রাণী হইয়া অবধি যাঁহার পরিচালনাধীন থাকিয়া ভিক্টোরিয়া সকল রাজকার্য্য সুচারুরূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন, আজ হঠাৎ একটা কূট রীতির বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে পদচ্যুত করিতে হইল। প্রিন্স আলবার্টের ন্যায় স্বামী পার্শ্বে না থাকিলে যে ভিক্টোরিয়া এ বিচ্ছেদ সহজে সহ্য করিতে পারিতেন, তাহা ত আমাদের মনে হয় না।

বিদায়কালীন লর্ড মেলবোর্ণ মহারাণীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন "আজ, চারি বৎসর কাল আমি আপনাকে প্রত্যহ দেখিতে পাইয়াছি। এখন চলিলাম। প্রিন্স আলবার্ট সকল বিষয়েই স্থিরবুদ্ধি এবং যোগ্য। তিনি আপনাকে সাবধানে রক্ষা করিতে পারিবেন।" এই বলিয়া চক্ষের জল ফেলিয়া রাজভক্ত মেলবোর্ণ বিদায় লইয়াছিলেন।

সার রবার্ট পীল নূতন প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হইলেন। এতদিন পর্য্যন্ত মহারাণী "টোরী" স্থিতিশীল দলের কাহাকেও বড় চিনিতেন না। স্থিতিশীল দলের প্রধানগণ মহারাণীর প্রতি তেমন সন্তুষ্ট ছিলেন না। বিশেষ প্রিন্স আলবার্টকে বিদেশী জানিয়া তাঁহারা তেমন খোলাখুলির সহিত ব্যবহার করিতেন না। টোরীপ্রধান সার রবার্ট প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হওয়ায় মহারাণী একটু চিন্তিত হইয়াছিলেন। কিন্তু সার রবার্ট খুব বিবেচক এবং বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মহারাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া এমন মধুর ভাবে ব্যবহার করিয়াছিলেন যে, সকল গোলমাল এবং মনান্তর এক দিনেই দূর হইয়া গেল।

তবে একটা গোল উঠিয়াছিল। মহারাণীর সঙ্গিনী "ডচেস্ বেড ফোর্ড" "ডচেস্ সদরল্যাণ্ড" এবং "লেডী নরম্যানবী" উচ্চপদস্থ হুইগ জমিদারের পত্নী। ইহাঁরা টোরী আমলেও মহারাণীর পার্শ্ববর্ত্তিনী থাকিলে টোরীদলের স্বার্থের হানি হইবার আশঙ্কা থাকিতে পারে। এই কারণে মন্ত্রী পীল এই কয়জন ভদ্র মহিলাকে পদত্যাগ করিতে অনুরোধ করেন। তাঁহার অনুরোধ রক্ষা হইল। মহারাণী মনোদুঃখে পুরাতন সঙ্গিনীগণকে বিদায় দিলেন।

নূতন মন্ত্রিদল পদারূঢ় হইয়াই প্রস্তাব করিলেন যে, সুকুমার শিল্পের উন্নতি-কামনায় একটা সভা করা উচিত, সেই সভার প্রধান হইবেন, প্রিন্স আলবার্ট। পার্লামেণ্ট বসিবার জন্যে একটা প্রকাণ্ড বাটী সেই সময়ে নির্ম্মিত হইতেছিল। তাহাতে যে সকল কারুকার্য্য করা থাকিবে, তাহারই পরিদর্শন জন্যে এই সভার গঠন। প্রিন্স আলবার্ট দক্ষ শিল্পী এবং গুণগ্রাহী। তিনি শিল্প কার্য্যের যথাযোগ্য তদারক করিতে পারিবেন বলিয়াই তাঁহাকে এই নূতন কার্য্যে ব্রতী করা হইল।

তখন বিলাতে "ডুয়েলিং" প্রথা প্রচলিত ছিল। কেহ কাহাকেও কোন প্রকারে অপমানিত করিলে উভয়ে একান্তে লড়াই করিত। সেনাদলের মধ্যেই এই ব্যবহারের বিশেষ চলন ছিল। একটু "পান থেকে চুণ খসিলেই" অমনি যুদ্ধং দেহি বলিয়া আহ্বান! আহ্বান হইলেই, দুইপক্ষের দুইজন

"সেকেণ্ড" বা বন্ধু বাছাই করা হইত। বন্ধু মহাশয় দ্বয় নরহত্যার সকল যোগাড়যন্ত্র করিয়া দিতেন। পরে দুইজন অপমানিত এবং অপমানকারক যথানির্দ্দিষ্ট সময়ে যথানির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া উপস্থিত হইতেন; এবং একজন অপরকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক ছুড়িতেন। যাহার লক্ষ্য অব্যর্থ, হইত সেই অপরকে মারিত। এই নৃশংস ব্যাপার প্রিন্স আলবার্টের উদ্যোগে এবং মহাবীর বৃদ্ধ ডিউক অব ওয়েলিংটনের সহায়তায় বিলাত হইতে উঠিয়া গেল। মহারাণী স্বয়ং বিশেষ চেষ্টা করিয়া, নানা লোককে বলিয়া উহা বন্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

এই সময়ে মহারাণী অতি সুখেই দিনাতিপাত করিতেছিলেন। মনে কোন প্রকার ক্ষোভ বা কষ্ট ছিল না। হৃদয়ে কোন প্রকার উদ্বেগ ছিল না; রাজ্যের অবস্থা মন্দ ছিল না। স্বামী পত্নী অনুরাগী, সোনার চাঁদ দুইটি ছেলে ও মেয়ে;—এত সুখ কি আর কাহারও হয়, না হইতে পারে?

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

১৮৪২ সাল কিন্তু দুঃখের বোঝা মাথায় করিয়া আনিল। প্রথম দুঃসংবাদ আসিল, ভারতের প্রান্তসীমা হইতে। আফগানিস্থানে সার উইলিয়ম ম্যাক-নাটেন ইংরেজ সেনানী হইয়া গিয়াছিলেন। সার আলেকজণ্ডর বরনস্ ইংরেজ দূত ছিলেন। দেশের রাজা দোস্ত মহম্মদ পলাতক। তাহার ধূর্ত্তপুত্র আকবর খাঁ কাবুলে থাকিয়া ইংরেজের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছিল। আমীর ছিলেন শা সুজা। ধূর্ত্ত নৃসংশ আকবর খাঁ ইংরেজ সেনাদলের উপর আপতিত হইয়া সকলকে শৃঙ্খলাশূন্য করিয়া কাবুল হইতে বিতাড়িত করিয়া দিয়াছিলেন। কোন এক ডাক্তার ব্রাইডন্ ভারতে ফিরিয়া আসিতে পারিয়াছিলেন। এই সমাচারে বিলাতবাসিগণ স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। তখন ভারতের বড়লাট লর্ড অকল্যাণ্ড।

তিনি এই পরাজয়ের পরই বিলাত চলিয়া গেলেন; তাঁহার স্থানে বড় লাট হইয়া ছিলেন লর্ড এলেনবরো। অবশ্য লর্ড অকলাণ্ড প্রতিশোধ লইবার সকল ব্যবস্থা-বন্দবস্ত করিয়া গিয়াছিলেন। লাট এলেনবরা আসিয়া, তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়া, আফগানদিগকে বিষম যুদ্ধে পরাজিত করিয়া, তাহাদের বাজার-ঘর তোপে উড়াইয়া দিয়া, গজনী হইতে সোমনাথের চন্দনকাষ্ঠের দরওয়াজা কাড়িয়া আনিয়া যথা-উপযুক্ত প্রতিশোধ দিয়াছিলেন।

এই সময়ে চীনদের সঙ্গেও ইংরেজের একটা ছোট-খাট লড়াই বাধে। ইংরেজ, চীন-কীয়াঙ্গচু নামক স্থান অধিকার করিয়া, নানকীন সহরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তখন চীন ইংরেজের বশ্যতা স্বীকার করিয়া অহি-ফেন ব্যবসায়ের একটা চুক্তি করিলেন। আর যাহাতে ইংরেজ পাদ্রীগণ চীনে নিরাপদে থাকিতে পারেন, তাহারও ব্যবস্থা করা হইল।

বিদেশের যেমন হয়, এক রকম ব্যবস্থাত হইল; কিন্তু স্বদেশ ইংলণ্ডে প্রজাগণের বিষম কষ্ট হইতে লাগিল। চাষী এবং মজুরদের অন্ন হওয়া দিন দিন কঠিন হইয়া উঠিতে লাগিল। রাজকর বৎসরে বৎসরে কমিয়া যাইতে লাগিল; রাজকোষ ধীরে ধীরে অর্থশূন্য হইল; রাজাকে দিন দিন ঋণ করিতে হইতেছিল। বিলাতে শস্যাদি আমদানী এবং রপ্তানী বিষয়ে একটা কর ধার্য্য ছিল। আমদানী রপ্তানীর পথ আটক থাকাতে ব্যবসায় তেমন ভাল করিয়া চলিত না। হয়, কোন বার এত উৎপন্ন হইত যে চাষীর লোকসান সহিত হইত; নহিলে এত কম হইত যে, প্রজাগণ অনাহারে দিন কাটাইত। আইনের দৃষ্টিতে যে অবস্থা হইলে দেশের মঙ্গল হইবে, ঠিক সে অবস্থা কখনও হইত না। কাজেই কষ্টও কখন দূর হইত না। শেষে বিলাতের অনেক লোক ভাবিল যে শস্য রপ্তানী এবং আমদানীর উপর যে মাশুল আছে, তাহা উঠাইয়া দেওয়া উচিত।

হৈমন্তিক অবকাশের পর ফেব্রুয়ারী মাসে যখন পার্লামেণ্টের প্রথম অধিবেশন হয়, অথবা নূতন বাছাইয়ের পর যেমন পার্লামেণ্ট নূতন করিয়া বসে,

তখন রাজা বা রাণী একটা আদেশ-পত্র পাঠ করিয়া থাকেন। এই আদেশ-পত্রে রাজ্যের সুখের দুঃখের অবস্থার কথা লেখা থাকে, ভবিষ্যতে রাজ-মন্ত্রিগণ কিরূপ কার্য্য করিবেন, তাঁহারও আভাষ থাকে!

১৮৪২ সালে মহারাণী স্বয়ং পার্লমেণ্ট গৃহে যাইয়া আদেশপত্র পাঠ করিয়াছিলেন। সে দিন লণ্ডন নগরে খুব জনতা হয়, পথের দুধারে সারি-বাঁধিয়া লোক দাঁড়াইয়া থাকে। পার্লমেণ্টগৃহে বড় বড় মান্য গণ্য লোকের ভিড় হয়। বিবিরা অদ্ভুত, অতি সুন্দর পরিচ্ছদে আবৃত হইয়া—যেন রূপের ডালি হাতে করিয়া, তথায় উপস্থিত হইয়া থাকেন। সে দিন পার্লমেণ্ট-গৃহ যেন ইন্দ্রের নন্দনকানন হয়; যেন কোটীচন্দ্র রূপের প্রভা লইয়া জগৎ আলোকিত করিয়া, লোক-লোচন-মুগ্ধ-বিমূঢ় করিয়া উদিত হয়। এই রূপের অপরূপ সরোবরে আমাদের মহারাণী সহস্রদল পদ্মের ন্যায় যেন ঝলমল করিতে থাকেন। তাঁহার সেই বিনাবিনিন্দিত কণ্ঠ সেই খঞ্জননয়নের অপূর্ব্ব লাবণ্য-প্রভা সেই পবিত্র দেবী মূর্ত্তি ইংলণ্ডের সকল শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে স্তম্ভিত করিয়া রাখে। যেমন জগতের শ্রেষ্ঠ জাতি ইংরেজ, তেমনি জগতের দেবী,—রাণী ভিক্টোরিয়া।

সেবার কার আদেশ পত্রে অনেক আশার কথা লেখা ছিল; কিন্তু সকল আশা পূর্ণ হয় নাই।

এই সময়ে আবার দুইবার মহারাণীর প্রাণহত্যা করিবার জন্যে একজন ঘাতক গুপ্ত চেষ্টা করিয়াছিল। প্রথম ঘাতকের নাম জন ফ্রান্সিস। ৩০শে মে তারিখে সন্ধ্যা সাতটার সময়ে ফ্রান্সিস নিজের পকেট হইতে একটা পিস্তল বাহির করিয়া রাণীর গাড়ি লক্ষ্য করিয়া আওয়াজ করে। গাড়ি হইতে প্রায় চারিহাত দূরে দুষ্ট রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়াছিল। একজন কনষ্টবল এবং একজন সেনাদলের পদাতি ইহাকে গ্রেপ্তার করে। লোকটা ধরা পড়িলে পর কোন কথাই কহে নাই। পার্লমেণ্ট গৃহে এই সমাচার পঁহুচিতেই, একটা মহা-গোলমাল, হৈ হৈ পড়িয়াগেল। পার্লামেণ্টের অধিবেশন হইতেছিল, তাহা

বন্ধ হইল। সকলেই দৌড়িয়া মহারাণীকে দেখিতে আসিলেন। ঘটনার সময়ে মহারাণী খুব গাম্ভির্য্য প্রাকাশ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরে তিনি এক প্রকার অবসন্ন হইয়া পড়েন। ডাক্তার মহাশয় মহারাণীকে পরীক্ষা করিয়া বলেন যে আপনি নিত্য যেমন বেড়াইতে গিয়া থাকেন, তেমনি যাইবেন। মহারাণীও বলিলেন,—"হাঁ, ঠিক বলিয়াছেন এমন, প্রাণের আতঙ্কে আমি কতদিন বাঁচিতে পারি। অহরহ প্রাণের ভয়ে ভীত থাকা অপেক্ষা মরা ভাল। আমি নিত্য যেমন বেড়াইতে গিয়া থাকি, তেমনি যাইব। কোন অন্যথা করিব না।" এই ফ্রান্সিসই পূর্ব্ব দিন একবার বন্দুক ছুড়িবার চেষ্টা করে; কিন্তু সে দিন আওয়াজ হয় নাই। দ্বিতীয় দিন আওয়াজ হইয়াছিল বটে; কিন্তু ভগবানের কৃপায় মহারাণী রক্ষা পাইয়াছিলেন।

পৃথিবীতে এমন পাগল, এমন পিশাচ ও আছে যে, কেবল হৈ চৈ করিবার জন্যে, কেবল নামের জন্যে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ন্যায় দেবীকে হত্যা চেষ্টায় বিরত থাকে না।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

বিবাহের পর মহারাণী প্রিন্স আলবার্টকে কাছে রাখিয়া দুইজনে সুখে কালাতিপাত করিতেছিলেন। রাজ্যের 'কোন স্থানেই ভ্রমণ উদ্দেশ্যে—পরিদর্শন ত দূরের কথা, যাইবার সময় করিতে পারেন নাই। কিন্তু ১৮৪২ সালে অনেক ভাবনাচিন্তার পর একবার রাজ্য পরিদর্শন করিবার জন্যে উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন। স্থির হইল, স্কটলণ্ড প্রদেশে যাইতে হইবে। রাজকর্ম্মচারিগণ সকল ব্যবস্থা করিলে পর, ২৯শে আগষ্ট তারিখে স্বামী আলবার্টকে সঙ্গে লইয়া "রয়েল জর্জ্জ" নামক জাহাজে আরোহণ করিয়া, তিনি স্কটলণ্ড যাত্রা করিলেন। পথে সকল গ্রাম ও বন্দরের নিকটবর্ত্তি গ্রামসমূহ হইতে রাজভক্ত প্রজাগণ আসিয়া মহারাণীকে প্রণাম আদি—রাজার প্রতি সম্মান এবং পূজাসূচক

ব্যবহার করিয়া চলিয়া যাইত। তীরস্থ প্রত্যেক গিরিশৃঙ্গ হইতে আলোক-মালা সমুদ্রবক্ষে, অর্ণবযানে প্রতিফলিত হইয়া, রাজভক্তির বহ্নি-নিশান উড়াইত। ইতিপূর্ব্বে মহারাণী জানিতে পারেন নাই যে, তাঁহার রাজভক্ত প্রজাগণ তাঁহাকে এত ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। তিনি যে প্রকৃতি পুঞ্জের কাছে দেবী ঈশ্বরী বলিয়া পূজিত হইতেন, তাহা তিনি তেমন বুঝিতে পারেন নাই। এইবার স্কটলণ্ড যাইবার পথে প্রজাগণের অপূর্ব্ব রাজভক্তির বিকাশ দেখিয়া, তিনি বিস্মিত এবং পুলকিত হইয়াছিলেন।

১লা সেপ্টম্বর তারিখের পর তিনি স্বদলবলে এডিনবরা নগরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বহুদিন এডিনবরা নগরে রাজচরণসংস্পর্শে পবিত্র হয় নাই। বহুদিন স্কটলণ্ডবাসিগণ রাজদর্শনে কৃতার্থ হয় নাই। এতদিন পরে দেবী ভিক্টোরিয়াকে পাইয়া তাহারা যেন দিশহারা হইয়া উঠিল। ত্রিশ-চল্লিশ ক্রোশ দূর হইতে কত রাজভক্ত স্কচ প্রজা হাঁটিয়া আসিয়া ভিক্টোরিয়া দর্শন করিয়া গিয়াছিল। এডিনবরা নগরীও অপূর্ব্ব সাজে সজ্জিত হইয়াছিল। লণ্ডন হইতে সমুদ্রপথে এডিনবরা পর্য্যন্ত আসিতে মহারাণীর খুব মাথাঘোর রোগ হইয়াছিল। এই রোগকে "সমুদ্রের ব্যারাম" বলা যায়। একটু সুস্থ হইলে, একদিন এডিনবরা নগরের প্রধান প্রবান পথ দিয়া মহারণী খুব সাজ-সজ্জা করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন। নগরের প্রধান নাগরিকগণ তাঁহায় রাজ্যেশ্বরীর সজ্জা দেখিতে চাহিয়াছিল। তাহাদের সাধ মিটাইবার জন্যে মহারাণীর এই ভ্রমণ। এডিনবরা ব্যতীত স্কটলণ্ডের অন্যান্য সকল প্রধান নগরীতে তিনি পদার্পণ করিয়াছিলেন। সকল স্থানেই প্রজাগণের অসীম রাজভক্তি দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিবার পূর্ব্বেই তিনি সঙ্গের সচিব লর্ড এবারডীনকে আজ্ঞা করেন যে, স্কটলণ্ডবাসী-দিগের উদ্দেশ্য একখানি রাজ-সন্তোষজ্ঞাপক পত্র লিখিতে হইবে। ঐ পত্রে লেখা থাকে যেন স্কটলণ্ডবাসিগণ যে রাজভক্ত, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই; তবে এত আগ্রহ, এত আকাঙ্ক্ষা, এত উৎকণ্ঠা, মহারাণীকে দেখিবার জন্যে

প্রজাগণের হইতে পারে, এইটুকু বুঝিয়াই মহারাণী অত্যন্ত প্রীত এবং আপ্যায়িত হইয়াছেন।

মহারণীর খুড়া ডিউক অব সসেক্সের ২১শে এপ্রেল তারিখে দেহান্তর হয়। মহারাণী যখন রাজসিংহাসনে অভিষিক্তা হইতেছিলেন সেই সময়ে বৃদ্ধ খুল্লতাত রাজ্যেশ্বরীকে প্রজার পূজা দিবার জন্যে, বশ্যতা দেখাইবার জন্য, যেমনি জানু পাতিয়া করচুম্বন করিতে যাইবেন, আর অমনি ভিক্টোরিয়া রাজোচিত সম্মান-সম্ভ্রম বিস্মৃত হইয়া, রাজাসনত্যাগ করিয়া বৃদ্ধ খুড়া মহ,-শয়কে গলা জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন দিয়াছিলেন। ভ্রাতুষ্পুত্রী ভিক্টোরিয়া এমন স্নেহময়ী যে, বৃদ্ধও কর্ত্তব্য ভুলিয়া গিয়া, ভিক্টোরিয়া যে রাজ্যেশ্বরী সর্ব্বময়ী তাহাও বিস্মৃত হইয়া, স্নেহাধিক্যবশতঃ তাঁহাকে নিজের কন্যা মতন আদর করিয়াছিলেন। সেই স্নেহময় খুল্লতাত এতদিন পরে ইহলোক ত্যাগ করিলেন। ভিক্টোরিয়ার বেশ শোক লাগিয়াছিল। তিনি অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। মহারাণীর খুল্লতাতের যেমন ধূমধামের সহিত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হয়, ঠিক তেমনি ধূমধামের সহিত কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল।

এই সময়ে—২৫শে এপ্রেল তারিখে মহারাণী আর একটি কন্যা-সন্তান প্রসব করিলেন। এবার প্রসবকালে মহারাণীকে বিশেষ ব্যাথা পাইতে হয় নাই। রাজনীতিকগণ এবং প্রধান রাজকর্ম্মচারিগণ উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই কন্যা ভূমিষ্ঠা হইয়াছিলেন। কন্যার নাম হইল, রাজকুমারী আলিস্। পাঠক, পরে এই রাজকুমারীর অনেক গুণের কথা শুনিতে পাইবেন। ইনি সাক্ষাৎ দেবীরূপিনী। এমন মিষ্টভাষিণী, মধুরহাসিনী, কর্ত্তব্যপরায়ণা, দয়াময়ী কন্যা মহারাণীর বুঝি আর একটিও হয় নাই। রাজকুমারী সেবায় রুক্মিণী, রন্ধনে অন্নপূর্ণা, শিষ্টাচারে গান্ধারী, সহিষ্ণুতায় ধরিত্রী সদৃশী হইয়াছিলেন পিতার সেবা করিতে, মাতাকে সুখে দুঃখে সান্ত্বনা দিতে বুঝি আর দ্বিতীয় ব্যক্তি ছিল না।

ষট্‌বিংশ পরিচ্ছেদ।

সুকুমার শিল্পের উন্নতির জন্যে এক মণ্ডলী গঠিত হয় প্রিন্স আলবার্ট উহার অধিনায়ক হইয়াছিলেন। সেই সভার কার্য্য নিয়মিত আরম্ভ হইলে আলবার্ট নিত্য পার্লামেণ্ট বাটীতে শিল্পিগণের কারুকার্য্য দেখিতে যাইতেন। প্রত্যহ প্রাতকালে ঈশ্বর উপাসনার পর মহারাণী এবং অলাবর্ট উভয়েই দেখিতে যাইতেন, তথায় রাজকুমার ও জ্যেষ্ঠা কুমারীকেও লইয়া যাওয়া হইত। ইংলণ্ডের মহারাণী স্বামীপুত্রসহ পরমসুখে হাসিমুখে বিচরণ করিতেছেন; একটুও দুঃখের বা ক্ষোভের ক্ষীণছায়াও কাহারও মুখে পড়ে নাই। বেশ সরল উদার প্রণয়ের পুর্ণ-উচ্ছ্বাসে পতি-পত্নী চারিচক্ষু এক করিয়া কথা কহিতেছেন—এ দৃশ্য যে দেখিত সেই মুগ্ধ হইত, সেই বিস্মিত হইত। রাজসংসারে এত দাম্পত্যসুখ আর কোথাও ছিল কি না, আর কোথাও আছে কি না সহজে কেহ তাহা বলিতে পারিবে না।

মহারাণী ১৮৪৩ সালের আগষ্ট মাসে আলবার্টকে সঙ্গে করিয়া সমুদ্র-বিহারে বাহির হইয়াছিলেন। জাহাজে করিয়া অন্যান্যস্থান পরিদর্শনের পর তিনি ফালমৌথ গ্রামে আসিয়া পঁহুছিলেন। তথাকার প্রধান ব্যক্তি বা মেয়র কোয়েকার ধর্ম্মাবলম্বী। কোয়েকার খৃষ্টানগণ কাহারও সমক্ষে মাথার টোপ খোলে না; কিন্তু রাজার কাছে অধীনতাব্যঞ্জক খোলা মাথায় দাঁড়াইতেই হইবে। মেয়র সাহেব নিজ ধর্ম্মমতের কথা মহারাণীকে জানাইলে তিনি হাসিমুখে তাঁহার মাথার টোপ মাথায় রাখিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। সামান্য বিষয়েও মহারাণী কখনও কাহাকেও মনোবেদনা দেন নাই।

যখন ফালমৌথ হইতে ফরাসীর কূলে শেরবর্গ বন্দরে আসিতেছিলেন, তখন একদিন মহারাণী জাহাজের চাকার আড়ালে একটা দরজার সম্মুখে অন্যান্য সঙ্গিণীগণ পরিবৃত হইয়া বসিয়া গল্প করিতেছিলেন। তাঁহারা সকলে বিশাল বিস্তৃত নীল সমুদ্রের পানে তাকাইয়া কত কথাই কহিতেছিলেন, এমন

সময়ে নাবিকাদগের মধ্যে একটা কেমন চুপি চুপি কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল। একদল জাহাজী গোরা আইসে, মহারাণীাক অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখায়, আর ম্লান মুখে চলিয়া যায়। শেষে বড় কর্ত্তা লর্ড ফিজক্লারেন্সকেও আসিয়া হাজির হইতে হইল। মহারাণী এই সকল জটলার ব্যাপার পূর্ব্বেই লক্ষ্য করিয়াছিলেন, বড় নাবিক-লাটকেও আসিতে দেখিয়া, তিনি মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার খানা কি? রাজবিদ্রোহ হইবে নাকি?" উত্তরে সাহেব বলিলেন, "কতকটা সেই রকম বটে। মহারাণীকে ঐ স্থান ত্যাগ করিতে হইয়াছে। একটু অনুগ্রহ করিয়া স্বতন্ত্র স্থানে গিয়া বসুন।" মহারাণী বলিলেন—"কেন, অপরাধ!" নৌ-লাট প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—"আজ্ঞা, নাবিকদের সরাব ঘরের দরজায় আপনি ঠেস দিয়া বসিয়া আছেন। দরজা না ছাড়িলে নাবিকগণের গ্রগ সরাব পান করা হইবে না।"

মহারাণী। এক সর্ত্তে পথ ছাড়িতে পারি।

নৌ-লাট! কি আজ্ঞা হয়, এমন কি সর্ত্ত, যাহা আমরা গ্রাহ্য করিতে পারিব না।

মহারাণী। আমাকে যদি এক গেলাস গ্রগসরাব দেও ত পথ ছাড়িব।

রাজ্যেশ্বরীর আবদার, কাহার সাধ্য প্রতিরোধ করে? হুকুমমত এক গেলাস গ্রগসরাব আসিল। মহারাণী পান করিলেন এবং নাবিকগণের সুখ কামনা করিলেন। সরল ইংরেজ জাহাজী গোরা সকল মহারাণীর এই অপূর্ব্ব ব্যবহার দেখিয়া গগন-বিদারী জয় ধ্বনিতে সমুদ্রবক্ষ বিচলিত করিয়া তুলিল।

ফরাসীস্ বন্দর ঈউ নগরের সম্মুখে যখন মহারাণীর জাহাজ গিয়া পঁহুছিল, তখন কূল হইতে ফরাসীগণ ঘন ঘন তোপ-ধ্বনি করিতে লাগিল। ফ্রান্স দেশে তখন লুই ফিলিপ রাজা। ইনি বোঁর্বোবংশজ, অতি সাধু এবং সরল প্রকৃতির লোক। লুই ফিলিপ আমাদের মহারাণীকে প্রত্যুদ্গমন করিবার মানসে স্বয়ং দলবল সমভিব্যাহারে মহারাণীর জাহাজে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ভিক্টোরিয়াও অগ্রবর্ত্তিনী হইয়া তাঁহাকে সম্ভাষণ করিলেন। ইয়ুরোপীয় শিষ্টাচারের রীত্যনুযায়ী রাজা লুই মহারাণীকে সাদরে আলিঙ্গন করিলেন এবং তাঁহার দুই কপোলে স্নেহের সম্ভাষণ করিলেন; পরে হাত ধরিয়া চুম্বন করিলেন। প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বে একবার একজন ইংরেজ রাজা ফরাসী দেশে আসিয়াছিলেন। তাহার পর আর কেহ ফরাসী পতির সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসে নাই। ফরাসী-ইংরেজের চিরদিনই শত্রুতা ছিল—এখনও বেশ আছে। তবে বাহিরের শিষ্টাচার সম্বন্ধ পূর্ব্বে ছিল না, এখন মহারাণীই নিজের উদার্য্যগুণে সংস্থাপিত করিয়াছেন।

লুই রাজা মহারাণীকে সঙ্গে করিয়া তীরে লইয়া গেলেন। সমুদ্রকূল হইতে মহারাণীর হাত ধরিয়া রাজা উপরে লইয়া গেলেন। তথায় ফরাসী রাণী মেরী এমিলী উপস্থিত ছিলেন। দুই রাণীতে স্নেহের আলিঙ্গন করিলেন। দুই রাণীতে কপোলে চুম্বন করিলেন। একটা বিরাট আনন্দ রোল লোক জনতা হইতে উত্থিত হইল। একটা যেন অপার্থীব করতালির চটপটা-ধ্বনি শ্রবণপুটকে স্তম্ভিত করিয়া দিল। পরদিন সকল রাজারাণী মিলিয়া বনবিহার করিলেন; পান, আহার, নাচ, তামাসা হইল। একদিন আমোদ-আহ্লাদ করিয়া মহারাণী বিলাত প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাঁহার জাহাজের সঙ্গে অনেকগুলি ফরাসী রণতরী ইংলণ্ডের উপকূল পর্য্যন্ত গিয়াছিল। যে দিন মহারাণীর জাহাজ ব্রাইটনে পঁহুছিল, সেই দিন নাগরীকগণ জলকেলি করিতেছিল। মহারাণী আসিয়াছেন শুনিয়া, সন্তরণশীলা যুবতী রমণীগণ সাঁতার দিয়া প্রায় মহারাণীর জাহাজের নিকটে আসিয়াছিল। মহারাণী জাহাজের উপর হইতে তাহাদের দেখাইয়া স্বহস্ত বারম্বার চুম্বন করিয়া আপ্যায়িত করিয়াছিলেন।

বিলাতে দুই দিন বিশ্রামের পর মহারাণী আলবার্টকে সঙ্গে লইয়া বেলজিয়ম প্রদেশ দেখিতে বাহির হইলেন। বেলজিয়মের বড় বড় সহর ও দর্শনীয় স্থান দেখিয়া তথাকার রাজা ও রাণীর আতিথ্য গ্রহণ করিয়া এবং

শিষ্টাচারে মুগ্ধ হইয়া, ২১শে সেপ্টম্বর তারিখে তিনি আবার বিলাতে প্রত্যাগমন করিলেন। এই জলবিহার ও দেশ পর্য্যটনে উভয়েরই দেহ পুষ্ট, মন হৃষ্ট হইয়াছিল ;—স্বামী স্ত্রী উভয়ই পরমানন্দে দিন কাটাইয়া ছিলেন।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

অক্টোবর মাসে আলবার্ট এক নূতন সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। মহারাণীর সঙ্গে তিনি ক্যাম্ব্রিজ-বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন জন্যে গিয়াছিলেন। তথায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারীগণ একযোট হইয়া পরামর্শ করিয়া আলবার্টকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাধি এল্-এল্ ডি প্রদান করিল। আলবার্ট জানু পাতিয়া নত-শিরে মহারাণীর সুকোমল করকমল হইতে উপাধির সনন্দ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই সভায় যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের অনেকে বলেন যে মহারাণী যখন হেঁটমুণ্ড নতজানু আলবার্টকে উপাধি পত্র দান করিতেছিলেন, এবং আলবার্ট সাগ্রহে যখন মহারাণীর পরিচ্ছদ পার্শ্ব চুম্বন করিয়া সনন্দ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন উভয়ই চকিতের ন্যায় হাসিয়া ফেলিয়াছিলেন। স্বামী স্ত্রীর সর্ব্বসমক্ষে এ রঙ্গ মন্দ দেখায় নাই।

এই সময় মহারাণী খুব গান গাহিতেন, নাচিতেন, খেলিতেন। ছোট ছোট ছেলেদের সঙ্গে নিয়মিত দৌড়াদৌড়ি করিতেন ও দুষ্টামী করিতেন। তাঁহার সদা রাগরঞ্জিত ঢলঢলে মুখখানি দেখিলে কেহ মনে করিতে পারিত না যে, ইনিই ইংলণ্ডেশ্বরী—সসাগরা পৃথীর অধীশ্বরী। রাজ্যেশ্বরীর এমন চিন্তাহীন, সদা-উৎফুল্ল, বিলোল-বিস্ফারিত নয়নযুগল কেহ কখন দেখে নাই। তাঁহাকে তখন দেখিলেই মনে হইত, ইনি বুঝি সর্ব্ব সুখের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। এত সুখ, এত আনন্দ, এত স্ফূর্ত্তি রাজ-সংসারে কখনও ছিল কি, এমন দাম্পত্য-প্রেম, এমন বালচটুতা, এমন সোহাগ-অনুরাগ মহারাণীর হৃদয়ে কেহ দেখিয়াছে

কি ? দেখে নাই, দেখা অসম্ভব ভাবিয়া ইংলণ্ডের লোক সে সময়ে মহারাণীকে দুই চক্ষু মেলিয়া দেখিত।

কিন্তু সুখ কখনও চিরস্থায়ী হয় না, হইতে পারে না। এই সময়ে সমাচার আসিল যে প্রিন্স আলবার্টের পিতা ডিউক সাক্‌সকোবর্গ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। মহারাণীর শ্বশুর ষাটবৎসর বয়সেই দেহান্তর হইয়াছিলেন। পিতৃশোকে আলবার্ট যেন ভাঙ্গিয়া পড়িলেন—নূতন শোক, প্রথম শোক, সকল শোকের শ্রেষ্ঠ শোক জন্মদাতার মৃত্যু শোক—আলবার্ট সহিতে পারিলেন না, মরমে যেন মরিয়া গেলেন। এই শোকচ্ছায়া মহারাণীকেও আক্রান্ত করিয়াছিল। মহারাণীও বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন। পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্যে আলবার্টকে জর্ম্মনি যাইতে হইল। বিবাহের পর আলবার্ট এবং মহারাণীর এই প্রথম বিচ্ছেদ হইল। এ বিচ্ছেদ উভয় পক্ষেই অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। অনবরত দুইজনে এক সঙ্গে থাকা, কাজেই পনের দিনের জন্যেও আলবার্টকে দূরে পাঠাইয়া স্থির থাকিতে মহারাণী যেন অপারগ হইলেন। আলবার্টও বিচ্ছেদের ব্যথায় বিশেষ পীড়িত হইয়াছিলেন। পিতৃশোক ভুলিয়া তিনি ডোবর হইতে মহারাণীকে এক পত্র লিখেন। তাহাতে লেখা থাকে,—“আমার আদরের আদর ; আমি এখানে প্রায় এক ঘণ্টাকাল আসিয়াছি ; এবং মনে মনে দুঃখ করিতেছি যে, কেন আগে আসিলাম, এই একঘণ্টা ত তোমার সঙ্গে কাটাইতে পারিতাম। আমি এখন এখানে বসিয়া পত্র লিখিতেছি, আর তুমি সেখানে আহারের উদ্যোগ করিতেছ। তোমার পার্শ্বের স্থানটি এই কয়দিনের জন্যে শূন্য থাকিবে। তোমার হয় ত কত কষ্ট হইবে। কিন্তু তোমার হৃদয়ের এক পার্শ্বে আমি যে একটু স্থান করিয়াছি, ভরসা করি, সে স্থান এ কয়দিন শূন্য রাখিবে না—তোমার হৃদয়ে আমি সদা উপস্থিত থাকিব। বিরহবিধুরা হইয়া চঞ্চল হইও না ; আমি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিব ; যত শীঘ্র পারি কাজ সারিয়া ফিরিয়া আসিব। অনবরত কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিবে, আর আমার আশাপথ চাহিয়া দিন গণিতে থাকিবে। কেমন ?”

পিতৃশোকক্লিষ্ট হইয়াও আলবার্ট এমন পত্র লিখিয়াছেন, উভয়ে মধ্যে কতনই প্রগাঢ় প্রণয় এবং আসক্তি!

এই বৎসর মহারাণী গৃহস্থালীর একটা সুন্দর বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। রান্নাবাড়ীতে প্রত্যহ অনেক অব্যবহৃত রুটি ফেলিয়া দেওয়া হইতে, বা যাহাকে তাহাকে দান করা হইত। মহারাণী নিয়ম করিলেন যে, ঐ পরিত্যক্ত রুটি উইণ্ডসরের নিকটবর্ত্তি সকল অনাথাশ্রম ও দরিদ্রশালায় বণ্টন করিয়া দিতে হইবে। এই উপায়ে অনেক দরিদ্রের সহজে আহারের ব্যবস্থা হইল। মহারাণীর রন্ধনশালা একটা বিরাট ব্যাপার—কল্পনাতীত; যেন অন্নপূর্ণার কাণ্ড! এক বৎসরের চাকরচাকরাণী সমেত এক লক্ষ তের হাজার লোক রাজসংসারে আহার পাইয়াছিল। অবশ্য বড় বড় বল-নাচ এবং সান্ধ্যভোজের *হিসাব রোজ-হিসাবে রাখা হয় না। সে সব ধরিলে দুই লক্ষের অধিক লোক আহার করিয়া থাকিবে।

রুষিয়ার বিখ্যাত জার নিকোলাস এই সময়ে ইংলণ্ডে আসিয়াছিলেন। সুন্দর সুঠাম দেহ, অপরূপ অনিন্দ্য কান্তি নিকোলাসের হৃদয় বড় কঠোর ছিল। তাহার ব্যবহার বড় রূঢ় ছিল। অমন দেহের ভিতরে অত কঠোরতা যে থাকিতে পারে, তাহাই কেহ কখনও স্বপ্নেও মনে করে নাই! জার নিকোলাস বিচালী পাতিয়া শয়ন করিতেন। একটা চামড়ার খোল তাঁহার কাছে থাকিত। যেখানে রাত্রি বাস করিতে হইবে সেই খানে কোন আস্তাবল হইতে বিচালি লইয়া সেই খোলে পুরিয়া, তোফা গদী করিয়া, তাহার উপরই সম্রাটের শয়ন হইত। রুষ সম্রাটের এই অদ্ভুত শয্যা ব্যবস্থা দেখিয়া মহারাণীর কর্ম্মচারীগণ খুব হাসিয়াছিলেন।

কিন্তু জার নিকোলাস আমাদের মহারাণীর মন মুগ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি প্রিন্স আলবার্টের দশমুখে সুখ্যাতি করিয়াছিলেন। জারের মুখে পতির সুখ্যাতি শুনিয়া মহারাণী সহজেই জারের অনুগতা হইয়াছিলেন।

এই বৎসর ৬ই আগষ্ট তারিখে মহারাণী ভিক্টোরিয়া আর একটি সন্তান

প্রসব করিলেন। ইতিপূর্ব্বে প্রত্যেকবারেই মহারাণী প্রসব বেদনায় কষ্ট পাইতে হইত, এবার কোন কষ্টই হয় নাই। এবং এত শীঘ্র পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল যে ঠিক প্রসবকালে কেহ উপস্থিত থাকিতে পারে নাই। নবকুমার ভূমিষ্ঠ হইবার চল্লিশ মিনিট পরেই বিলাতের বিখ্যাত টাইমস পত্রে এই আনন্দ-সমাচার প্রকাশিত হইয়াছিল। টাইমসে সংবাদ পাঠ করিয়া তবে লোকে দশদিক হইতে ছুটিয়া আইসে এবং নবকুমার দর্শন করে। এই রাজ-কুমারের নামকরণ হইল,—আলফ্রেড আর্ণেষ্ট আলবার্ট ।ডউক এডিনবরা।

ডিউক এডিনবরা পরে রুষ জারের কন্যাকে বিবাহ করিয়া, এখন পিতা-মহের রাজ্য সাক্সকোবর্গের অধীশ্বর হইয়া আছেন। ইহাঁর ন্যায় মিতব্যয়ী, তেজস্বী রাজকুমার খুব অল্পই দেখা যায়।

এই বৎসর আর একবার মহারাণী স্কটলণ্ড প্রদেশে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। সেখানে খুব আদর-সম্মান পাইয়া, আমোদ-আহ্লাদ করিয়া, লণ্ডনে ফিরিয়া আসিলেন।

ফরাসীপতি লুই ফিলিপ ১৮৪৪ সালে বিলাতে আইসেন। ইহাঁর পূর্ব্বে আর কোন ফরাসী রাজাই বিলাতে ইংরেজ রাজার সহিত দেখা করিতে আসেন নাই। লুই প্রথমে আসিলেন।

এই জন্য বিলাতবাসী লুই রাজাকে খুব ধূমধামের সহিত আদর করিয়া-ছিল। প্রিন্স আলবার্ট পোর্টস্মউথে গিয়া রাজাকে আনিতে গিয়াছিলেন। লুই রাজা আলবার্টকে য়ুরোপীয় রীত্যনুযায়ী সাগ্রহে আলিঙ্গন করিয়া দুই গালে দুইটি চুম্বন দিয়াছিলেন। মহারাণীর সঙ্গেও তেমনি আগ্রহের সহিত চুম্বন আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। লণ্ডনের নানাবিধ দর্শনীয় সামগ্রী দেখিয়া ভোজ নাচে মত্ত হইয়া দুই দিন পরে ইনি স্বদেশে চলিয়া গেলেন।

২৮শে অক্টোবর তারিখে রয়েল এক্সচেঞ্জ নামক বিরাট ব্যবসাগৃহ মহারাণী স্বয়ং প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। লণ্ডনের লর্ড মেয়ের মহারাণীকে অভ্যর্থনা করি-বার জন্য নিজ সাজে সাজিয়াছিলেন পথে কর্দ্দম অত্যন্ত হওয়ায় ইনি

একজোড়া খুব বড় বুট পায়ে দিয়াছিলেন। কিন্তু মহারাণীর সমক্ষে অমন বড় বুট জুতা পায়ে দিয়া হাজির হওয়া কায়দা নহে। কাজেই যখন মহারাণীর আসিবার সময় হইল, তখন তিনি বুট খুলিতে চেষ্টা করিলেন; এক পায়ের বুট খুলিল, অন্য পায়ের বুট খুলিল না। অথচ এই সময়ে মহারাণী আসিয়া উপস্থিত। তখন কাতর হইয়া তাড়াতাড়ি এক পায়ের বুট আঁটা রাখিয়া, অপর পায়ের খোলা বুট দিয়া মেয়র সাহেব রাণীর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রিন্স আলবার্টের বড় সাধ ছিল যে, রাণী ভিক্টোরিয়াকে সঙ্গে লইয়া নিজ জন্ম স্থান রোসেনোতে গিয়া দিনকয়েক স্বামী স্ত্রীরূপে বাস করেন। তাঁহার পৈতামহ স্থানে সস্ত্রীক গৃহস্থালী পাতাইতে বড়ই বাসনা বলবতী হইয়াছিল। কিন্তু ইংলণ্ডেশ্বরী ত আর কাহারও ঘরের গিন্নী হইয়া কেবল গৃহিণীপনা করিয়া দিন কাটাইতে পারেন না! তথাপি আলবার্টের সাধ মিটাইবার জন্যে তিনি এই বৎসরে আলবার্টকে সঙ্গে লইয়া শ্বশুরালয় গমন করিবার প্রস্তাব করিলেন। মহারাণীর ত আর শ্বশুরঘর করা হয় নাই—একবার শ্বশুরঘর করিতে হইবে।

এই প্রস্তাব শুনিয়া আলবার্টের দুই চক্ষে জলধারা আসিয়াছিল। সে সুখের শৈশবের পিতৃভূমিতে ইহকালের জীবন্ত দেবতা পিতা আর নাই; কে আর হাসিমুখে স্নেহের দুই বিশাল বাহু প্রসারণ করিয়া পুত্র ও রাণীবধূকে আলিঙ্গন করিয়া ঘরে লইবেন। এই কথা ভাবিয়া আলবার্ট চক্ষের জলে বুক ভাসাইয়া দিয়াছিলেন।

যাহা হউক, সুখে দুঃখে হাসি-কান্নাতে দুইজনে জর্ম্মণী যাত্রা করিলেন। যথাকালে আন্‌টোয়ার্প বন্দরে পঁহুছিয়া জর্ম্মণ রাজ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রষিয়ার রাজা উইলিয়ম খুব আদর-সম্মানের সহিত ইহাঁদের গ্রহণ করিয়াছিলেন।

প্রুসিয়ার রাজার কথা কহিবার এমন এক মিষ্ট হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গি ছিল যে অনায়াসেই তিনি লোকের হৃদয়াকর্ষণ করিতে পারিতনে। একদিন ভোজের পর তিনি পানীয় গেলাস হাতে করিয়া উঠিয়া বলিলেন,"—মহাশয়গণ! একটা কথা আমাদের ইংরেজী ও জর্ম্মণ ভাষাতে আছে যাহা আমাদের উভয় জাতির কর্ণে বড় মধুর শুনায়;—সে কথাটি কি জানেন—বিজয়া (ভিক্টোরিয়া?)। ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ওয়াটারলুর শ্মশানসম ভীষণ সমরক্ষেত্রে এই শব্দের মোহিনী শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া ইংরেজ ও জর্ম্মণ রণোন্মাদে মত্ত হইয়াছিল; আর আজ সেই শব্দ মূর্ত্তমতী হইয়া—বিজয়ারূপিণী হইয়া আমাদের নয়নগোচর হইয়াছেন; মহারাণী ভিক্টোরিয়া আমাদের আতিথ্যগ্রহণ করিয়াছেন, আপনারা এইবার সকলে মিলিয়া সেই ত্রিশ বৎসরের পুরাতন আবেগ উৎসাহে ইহাঁকে আদর অভ্যর্থনা করুণ। ইহাঁর দীর্ঘ জীবন কামনার সুরাপান করুন।" সুপটু চাটুকারের ন্যায় প্রুষীয় রাজের মুখে এই চতুল চাটুবচন শুনিয়া মহারাণীর স্ত্রহৃদয় সহজেই মুগ্ধ হইয়াছিল। বক্তৃতান্তে তিনি উঠিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে রাজার নিকটে যাইয়া তাঁহার দুই গালে দুইটি চুম্বন দিয়া নিজের আসন গ্রহণ করিলেন।

ইহার পর রাণী প্রিন্স আলবার্টকে সঙ্গে লইয়া শ্বশুরগৃহে গিয়া প্রায় সপ্তাহেক কাল অতিবাহিত কারিয়াছিলেন। বিশাল সম্রাজ্যের রাণীগিরির সাজ দূরে ফেলিয়া, সচিব মন্ত্রী আদিকে দূরে থাকিতে বলিয়া, রাজ কার্য্যের কাগজ পত্র দূরে রাখিতে বলিয়া, প্রেমময়ী রসময়ী ভিক্টোরিয়া স্বামীর সঙ্গে সাধারণ লোকের ন্যায় গৃহস্থালীর কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে লাগিলেন। ঘর-সংসার দেখা, রান্না-বান্না করা, বাজার করা, আমোদ আহ্লাদ করা, সবই যেন সাধারণ সামান্য দম্পতীর ন্যায় হইতে লাগিল। দুইজনে সন্ধ্যার সময়ে গলাগলি করিয়া বেড়াইতে যাইতেন, দুইজনে পাশাপাশী বসিয়া গীত গাইতেন, দুইজনে একাসনে জানু পাতিয়া দেবতার দেবতা, সম্রাটের সম্রাট জগদীশ্বরের উপাসনা করিতেন, দুইজনে মুখোমুখি বসিয়া বাইবেল পাঠ করিতেন, আর

ক্ষুদ্র বাতায়নপথে ক্ষুদ্রপক্ষীর কলকণ্ঠ শুনিয়া নির্ব্বাক্-নিস্পন্দ-ভাবে চারিচক্ষু এক করিয়া আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকিতেন। ভিক্টোরিয়া ভুলিয়াছিলেন যে, তিনি ইংলণ্ডেশ্বরী; আলবার্ট ভুলিয়াছিলেন যে, তিনি পৃথ্বীশ্বরীর পতি।

এত সুখ, এত ভালবাসা, এমন ঈশ্বরপ্রীতি আর কোথাও নাই। জীবনের সেই সর্ব্বসুখের সাতদিন কাটিয়া গেল—কোথা দিয়া কেমন করিয়া কাটিল, কেহ টের পাইলেন না। এ কয়দিন উভয়ের খাইবার নিয়ম ছিল না, শুইবার নিয়ম ছিল না, বেড়াইবার নিয়ম ছিল না। সাত দিন কাটিয়া গেল, উভয়কে আবার বিলাতে ফিরিয়া আসিতে হইল।

১৮৪৫।৪৬ সালে আয়ারলণ্ডে এক বিষম দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। মহারাণী এই অকালের দিনে দুঃখী দুঃস্থ প্রজাগণের সাহায্যের নিমিত্ত বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহার দরিদ্র প্রজাগণ দুই হাত তুলিয়া তাঁহাকে মা বলিয়া ডাকিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিল।

প্রধান মন্ত্রি সার রবার্টপীল এই বৎসর একবার পদত্যাদ করিয়াছিলেন; কিন্তু অপরপক্ষের লর্ড জনরসেল মন্ত্রিসভা গঠিত করিতে না পারায় পীল মহাশয় আবার প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিয়া শস্যের উপর মাশুল উঠাইয়া দিয়া অবাধ বাণিজ্যের পথ ইংলণ্ডে খুলিয়া দিলেন। এই "করন-ল" লইয়া বিলাতে খুব আন্দোলন হয়; দুই দলে কথার লড়াই বিষম হইয়াছিল।

এই বৎসরে মহারাণী আর একটি কন্যাপ্রসব করিয়াছিলেন।

একোনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ভীষণ ফরাসী বিপ্লবের পর হইতে য়ুরোপে রাজা-প্রজায় কেমন একটা বিদ্বেষভাব তুষানলের ন্যায় ধিকি ধিকি জ্বলিতেছিল। প্রজামাত্রেরই দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল যে, রাজা স্বেচ্ছাচারী এবং অত্যাচারী। প্রজার অর্থে রাজার

দেহ পুষ্ট হয়, রাজার বিলাস-ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধি হয়; কিন্তু রাজা প্রজার মঙ্গল কামনা করেন না; করিতে চাহেনও না। সুতরাং রাজাদের রাজতক্ত হইতে না তাড়াইতে পারিলে প্রজার আর মঙ্গল নাই। এই ভ্রমের বশবর্ত্তী হইয়া য়ুরোপের প্রজা রাজভক্তি ভুলিয়াছিল, সংসারের সুখ-শান্তি ছাড়িয়াছিল। বিশেষ ফরাসী বিপ্লবের পর প্রজাগণ বুঝিতে পারিয়াছিল যে, প্রজার সমবেত শক্তির সমক্ষে রাজা ধূলিকণার ন্যায় উড়িয়া যাইবে। প্রজার শক্তি তিল তিল সমাহরণ করিয়া রাজা শক্তিমান্; সেই শক্তি-সঞ্চয়ে বিশ্লেষণ ঘটিলে রাজা পঙ্গু হইয়াই পড়িবেন। য়ুরোপ-সমাজে যখন দুঃখ অতিশয় বৃদ্ধি হইল, যখন প্রজা পেটের জ্বালায়, দুরাশার তাড়নায় উন্মত্ত হইয়া উঠিল, যখন দেশের সকল অন্নহীনে দেখিল যে, রাজ্যের মধ্যে কেবল রাজা এবং তাঁহার সহচর অনুচরগণই বেশ সুখে আয়েসে আছে, তখন কাণ্ডাকাণ্ড-জ্ঞানহীন হইয়া প্রজাগণ বিদ্রোহী হইয়া রাজশক্তিকে চূর্ণ করিবার চেষ্টা করিল। ফ্রান্সে এ চেষ্টা ফলবতী হইয়াছিল। অন্যত্র হয় নাই। অন্যস্থানের অধীশ্বরগণ প্রজার আবদার কতকটা রক্ষা করিয়া, নিজেদের স্বেচ্ছাচার প্রবৃত্তি বিশেষ সংযত করিয়া, দুরন্ত রাজকর্ম্মচারিগণকে শাসনে রাখিয়া, প্রজাকে শান্ত করিতে পারিয়াছিলেন। পরন্ত রাজ্যপাট রক্ষা হইল বটে, কিন্তু রাজার সে দেবতার মর্য্যাদা আর রহিল না। পূর্ব্বে প্রজাগণ যেরূপ ভক্তিবিহ্বল-নেত্রে রাজা এবং রাজশক্তিকে দেখিত, ফরাসীস বিপ্লবের পর হইতে আর তাহা দেখিল না। রাজাকে রাজ্যের প্রধান চাকর বলিয়া অনেকেই স্থির করিল। প্রজার মঙ্গলের জন্যেই রাজ্যস্থাপন, প্রজার মঙ্গল চেষ্টাতেই রাজার রাজ-শক্তি-পরিচালন, প্রজাকে আপদবিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্যেই আহার-আচ্ছাদনের ক্লেশ রাজাকে অনুভব করিতে হয় না। নহিলে, রাজপ্রজা একই সামগ্রী উচ্চনীচ কেহ নাই, কেহ হইতে পারে না।

এইপ্রকার দানবের ধারণা য়ুরোপীয়গণের মাথায় ঢুকিয়া য়ুরোপ-সমাজকে পিশাচের তাণ্ডবক্ষেত্র করিয়া তুলিয়াছে। পরে যে কি হইবে, কিসে কি

দাঁড়াইবে, তাহা বলা সহজ নহে। যাহা হউক, ১৮৪৮ সালে প্রজাশক্তির আর একটা বিক্ষেপে ফ্রান্স বিধ্বস্তপ্রায় হইয়াছিল। রাজা লুইফিলিপ নিজের ওরলীয়াঁও বংশকে ফ্রান্সের রাজ-সিংহাসনে চিরস্থায়ী করিবার জন্যে বিধিমতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই চেষ্টাতে তিনি প্রজার অনেক উচিত এবং অনুচিত আবদার রক্ষা করিতে পারেন নাই। প্রজাকে তেমন আদরে রাখিতে পারেন নাই। কাজেই প্রজাপুঞ্জের কাছে রাজা বড়ই নিন্দাভাজন হইয়াছিলেন। ১৮৪৮ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে ফ্রান্সের রাজনগরী পারীর অধিবাসিগণ বিপ্লব করিয়া রাজাকে তাড়াইয়া দিবার উদ্‌যোগ করিল। রাজা বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, উন্মত্ত প্রজাপুঞ্জের সহিত সামান্য রাজতক্ত লইয়া নরশোণিতপাত করিতে চাহিলেন না। তিনি সহজে রাজ্যভার ছাড়িয়া দিলেন এবং একদিন গোপনে "জন স্মিথ" নাম গ্রহণ করিয়া ইংলণ্ডে পলাইয়া গেলেন।

এই ফরাসী-বিপ্লবের বাতাস বিলাতেও সেই সময়ে আসিয়াছিল। বিলাতের "চার্টিষ্টগণ" বিদ্রোহ করিবার যোগাড় করিয়াছিলেন। প্রজার অতিবৃদ্ধিতে দুঃখ অনিবার্য্য। ইংলণ্ডের প্রজাবৃদ্ধি অত্যন্ত হইয়াছিল। কাজেই দুঃখীর সংখ্যাও খুব বাড়িয়াছিল। য়ুরোপের খৃষ্টান প্রাক্তন কর্ম্মফল মানে না, কপাল মানে না, দুঃখকে সহচর করিয়া ভগবান্ ভাবিয়া তুষ্ট থাকিতে পারে না; ফলে দুঃখের তীব্র বৃশ্চিকদংশনে ইহারা দিশাহারা হইয়া যায়। যে কোন উপায়ে হউক দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা করে। যখন অধিবাসীর দুঃখাপনোদন-চেষ্টা বৃথা হইয়া যায়, যখন সকল চেষ্টাই বিফল হয়, তখন মুর্খ প্রজাগণ রাজাকে সকল দুঃখের মুল মনে করিয়া তাহা উৎপাটন করিবার চেষ্টা করে। বিলাতে রোজ-মজুরদের বড়ই কষ্ট হইয়াছিল, মজুরি জুটিত না, কাজ তেমন পাইত না,—এখনও পায় না; কাজেই আহারচ্ছাদন উপার্জ্জন করা কঠিন হইয়া পড়িল। সে সময়ে বিলাতের রোজমজুর এবং শিল্পিগণ একজোট হইয়া মনে করিল যে, রাজনীতিক অধিকারের প্রশস্ততা হইলে, হয় ত তাহাদের দুঃখ দূর হইবে। সুতরাং আইস, রাজনীতিক আন্দোলন করা যাউক। এই আন্দোলন করিতে

গিয়া রাজবিদ্রোহ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। মহারাণী ভিক্টোরিয়া যদি তেমন প্রজাবৎসলা না হইতেন, বিলাতের প্রাধান রাজনীতিকগণ যদি তেমন বিবেচক এবং বিজ্ঞ না হইতেন, তাহা হইলে এই "চার্টিষ্ট" বিদ্রোহের যে কি বিষময় ফল হইত, তাহা মনে করিতেও এখন শরীর শিহরিয়া উঠে।

রণবীর ওয়েলিংটন এবং অন্যান্য রাজভক্ত সেনানী ও সেনাগণ রাজ্যে শান্তিরক্ষা করিবার জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের ব্যবস্থাগুণে "চার্টিষ্টগণ" কোন ক্ষতি করিতে পারে নাই। তবে আন্দোলনের মূল সূত্র ধরিয়া জোসেফষ্টর্জ্জ সাহেব পরে পার্লামেণ্টে বিশেষ আন্দোলন করিয়াছিলেন; এবং রাজনীতিক অধিকার প্রসার বিষয়ে কথঞ্চিৎ কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

য়ুরোপ এবং ইংলণ্ডে এই বিষম উদ্বেলের সময়ে মহারাণীর চতুর্থী কন্যা রাজকুমারী লুসে জন্মগ্রহণ করিলেন। ইনি পরে বয়ঃস্থা হইয়া স্কটলণ্ডের প্রধান ডিউক আরগাইলের জ্যেষ্ঠ পুত্র মারকুইস লর্নকে বিবাহ করেন। প্রজাস্থানীয় একজন জমিদারপুত্রকে স্বামীত্বে বরণ করা ইংলণ্ডের রাজকুমারীর পক্ষে কম মনের বলের পরিচায়ক নহে।

এইবার প্রথমেই ৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে মহারাণী স্কটলণ্ডের বালমোরাল কাসল দেখিতে গমন করেন। এই বাড়ীটী লর্ড এবারডীনের নিকট হইতে খরিদ করিয়া মহারাণী উহাকে নিজের এক স্বতন্ত্র বাসস্থান করিলেন। বাল-মোরালের চারিদিকে অতিমনোহর দৃশ্য, দেখিলে নয়ন মন বিমোহিত হইয়া যায়। এইখানে মহারাণী আলবার্টের সঙ্গে অনেক সুখের দিন কাটাইয়াছেন।

বালমোরাল দেখিয়া আসিয়া মহারাণী নভেম্বর মাসে সমাচার পাইলেন যে,

তাঁহার বিশ্বাসী পুরাতন মন্ত্রী লর্ড মেলবোর্ণ মরিয়া গিয়াছেন। মেলবোর্ণের মৃত্যুতে মহারাণী বিশেষ শোকসন্তপ্ত হইয়াছিলেন। মেলবোর্ণ তাঁহার প্রথম প্রধান মন্ত্রী, তাঁহার শিক্ষাদাতা ও জ্ঞানদাতা। সেই মেলবোর্ণ ইহলোক ত্যাগ করিয়া গেল ; আর দেখা হইবে না ; এই চিন্তাতেই মহারাণীর স্নেহপূর্ণ হৃদয় ব্যথিত হইল।

অনেক দিন হইতে মহারাণীর আয়রলণ্ড দেখিবার ইচ্ছা হইয়াছিল। রাজকার্য্যের ভিড়ে সে বাসনা এত দিন অপূর্ণ ছিল। এইবার আগষ্ট মাসে ১৮৪৯ সালে, প্রিন্স আলবার্টকে সঙ্গে করিয়া আয়রলণ্ড দেখিতে গেলেন। সমুদ্রতীরস্থ সকল বড় বড় বন্দর দেখিয়া তিনি আয়রলণ্ডের প্রধান নগরী ডবলিনে আসিলেন। এখানে মহারাণীকে দেখিবার যেমন জনতা হইয়াছিল, এত বুঝি পূর্ব্বে কোথাও হয় নাই। যে দিন তিনি ডবলিন ছাড়িয়া চলিয়া আসিতেছিলেন, সেই দিন সমুদ্রতীরে এত লোকের ভিড় হইয়াছিল যে, তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য ব্যাপার। জাহাজের নীচের তলায় দুইজন সঙ্গিনীর সঙ্গে মহারাণী কথা কহিতেছিলেন ; লোকের ভিড় দেখিয়া, তিনি আর থাকিতে পারিলেন না। দ্রুতগতিতে জাহাজের চাকার পাশ দিয়া উঠিয়া ছাদের উপর যাইয়া হাজির হইলেন। যেখানে আলবার্ট ছিলেন, সেইখানে তাঁহার ঘাড়ে ভর দিয়া তিনি দাঁড়াইলেন ও বাম হস্তে সাদা রুমাল লইয়া কেবল উড়াইতে লাগিলেন ও প্রজাগণকে সম্ভাষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার এই অদ্ভুত শক্তিমত্তার পরিচয় পাইয়া প্রজাগণ বিস্মিত হইয়া মহারাণীর জয়ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল কাঁপাইয়া দিল।

এই বৎসরে বিলাতে কলেরা বা ওলাউঠায় মড়ক হয়। মহারাণী এই ভীষণ মড়ক হইতে প্রজাগণকে রক্ষা করিবার জন্যে যথাসম্ভব নানাপ্রকার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। গির্জ্জায় গির্জ্জায় ঈশ্বরোপাসনা হইয়াছিল, গ্রামে গ্রামে হাস্পাতাল হইয়াছিল। ভগবানের কৃপায় মড়কে তেমন প্রজাক্ষয় হয় নাই।

রাজা চতুর্থ উইলিয়মের পত্নী রাণী আডিলেড, আমাদের মহারাণীর জ্যেষ্ঠমাতা, এই বৎসরে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। রাণী আডিলেড মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন। তাঁহার পুত্রকন্যা ছিল না, কিন্তু ভিক্টোরিয়াকে তিনি কন্যার অধিক স্নেহ করিতেন।

১৮৫০ সালের ১লা মে তারিখে মহারাণীর সপ্তম পুত্র জন্মগ্রহণ করেন সে দিন মহারাণীর ডিউক অব ওয়েলিংটনের জন্মদিন; তাই রাজকুমারের নাম হইল "আর্থার, উইলিয়ম, প্যাটরিক, আলবার্ট, ডিউক কনট।"

এই সময়ে আয়রলণ্ডে রাজবিদ্বেষের ঢেউ একবার উঠিয়াছিল। মীচেল, মীঘর, এবং স্মিথ ওব্রায়েণ নামক তিন জন আইরিষকে রাজবিদ্বেষ অপরাধে বিচারালয়ে বিচারার্থ হাজির করা হইয়াছিল। তিন জনের মধ্যে দুই জনকে প্রমাণাভাবে ছাড়িয়া দেওয়া হইল; কেবল মীচেল অপরাধী সাব্যস্ত হইয়া চৌদ্দবৎসর জন্যে দ্বিপান্তরিত হইয়াছিল। এই বিচারের পর আয়রলণ্ডের জন্যে খাসবিদ্বেষ আইন পাশ হইয়াছিল।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

যখন প্রধান মন্ত্রী পীল রাজ্য শাসন করিতেছিলেন, তখন মহারাণী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, প্রিন্স আলবার্টের যেমন উচ্চ সম্বন্ধ, সমাজে তেমন উচ্চপদ নাই। যুবরাজ প্রিন্স ওয়েল্‌স্ যদিও আলবার্টের পুত্র, কিন্তু সামাজিকতা হিসাবে পিতা অপেক্ষা যুবরাজের মান-সম্ভ্রম অধিক। কোন বড় রাজদরবার হইলে যুবরাজ প্রথম আসন পাইবেন, বিদেশী বড় বড় রাজদূতগণ সম্মুখে আসন পাইবেন, কিন্তু প্রিন্স আলবার্ট মহারাণীর পিছনে, রাজসিংহাসনের অন্তরালে বসিবার আসন পাইবেন। কোন বিদেশী বড় রাজা আসিলে, গৃহস্বামী হইলেও তাঁহার প্রাধান্য থাকিবে না। সুতরাং প্রিন্স আলবার্টকে একটা উপাধি দিয়া উচ্চ-পদারূঢ় করা

উচিত। মহারাণী প্রস্তাব করিলেন যে, প্রিন্স আলবার্টকে "রাজা ও রাণী-ভর্ত্তা" বলা হউক। প্রধান মন্ত্রী ইহাতে আপত্তি করিলেন, বলিলেন যে, বিদেশীকে ইংরেজ রাজা উপাধি দিতে কখনই স্বীকৃত হইবেন না। এ প্রস্তাব পার্লামেণ্টে করিলে লোকে ক্ষেপিয়া উঠিবে; প্রিন্স আলবার্টের যে অল্পবিস্তর সুখ্যাতি এবং প্রতিপত্তি আছে, তাহা নষ্ট হইবে। মহামতি পীল তাই, নানাপ্রকার ফন্দি-ফিকীর করিয়া, নানাজনের সহিত পরামর্শ করিয়া, কোন উপায়ে প্রিন্স আলবার্টের "প্রিন্স কন্‌সার্ট" বা রাণীভর্ত্তা উপাধি দেওয়াইয়া দিলেন। এবং সকল দরবারে সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহারই প্রাধান্য অধিক থাকিবে, তাহারও ব্যবস্থা করিলেন। তবে এই মান-সম্ভ্রম মহারাণীর জীবনকালব্যাপী হইবে বলিয়া পার্লামেণ্টে ধার্য্য হইয়াছিল। যাহা হউক, মহারাণী এ ব্যবস্থায় বিশেষ সন্তুষ্ট না হইয়াও, অসন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না।

প্রিন্স কনসার্টের এই উপাধি গোলমাল চুকিয়া গেলে; তিনি সুকুমার শিল্পী-সভার সদস্যগণের সহিত পরামর্শ করিয়া একটা বিরাট অন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর উদ্‌যোগ করিতে লাগিলেন। ১৮৫১ সালের ১লা মে তারিখে লণ্ডন নগরের হাইডপার্কের মাঠে এই বিরাট প্রদর্শনী খোলা হয়। প্রদর্শনীর বাটী বিলাতের বিখ্যাত শিল্পী সার জোসেফ প্যাক্সটন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই বাটীটা আগাগোড়া কাচের ও লৌহপাতের দ্বারা নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে বিলাতে এমন প্রদর্শনীও কখনও হয় নাই, এমন নানাদেশের লোক লণ্ডননগরে কেবল তামাসা দেখিবার জন্যে কখনও আইসে নাই; এমন পৃথিবীর নানাদেশের অদ্ভুত, অপরূপ সামগ্রী কখনও এক স্থানে সমাহৃত হয় নাই। যেই তাহা দেখিয়াছিল, সেই মুগ্ধ হইয়াছিল। আর যখন সকলে বুঝিল যে, এই অপূর্ব্ব ব্যাপার প্রিন্স কনসার্টের উদ্‌যোগে সিদ্ধ হইয়াছে, তখন পূর্ব্বের সকল কথা ভুলিয়া গিয়া ইংলণ্ডবাসিগণ আলবার্টকে প্রকৃতই রাজভক্তি প্রদর্শন করিয়াছিল। প্রদর্শনী খুলিবার দিন রাজপরিবারের সকলেই সমবেত হইয়া এক্‌জিবিসনস্থলে গিয়াছিলেন। প্রায় সাড়ে পাঁচ মাস

প্রদর্শনী খোলা ছিল, এই সময়ের মধ্যে প্রদর্শনী দেখিতে বাষট্টিলক্ষ লোক গিয়াছিল; এবং দর্শনী হিসাবে প্রায় এককোটি টাকা জমা হইয়াছিল। এই দর্শনীর টাকা হইতে প্রদর্শনীর সকল ব্যয় সংকুলন হইয়া কিছু লাভও দাঁড়াইয়াছিল।

এই বৎসরে হানোভরের রাজার দেহান্তর হয়। ইনি ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় জর্জ্জের পঞ্চম পুত্র ছিলেন। হঙ্গেরীর দেশহিতৈষী তেজস্বী লুই কস্থথ এই বৎসরেই অষ্ট্রীয়া-রাজার অত্যাচার হইতে অব্যাহতি পাইবার মানসে বিলাতে পলাইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার আগমনে লণ্ডন সহর যেন বিক্ষুব্ধ হইয়াছিল। অতবড় বক্তা বুঝি ইদানী এ জগতে আর জন্মায় নাই।

পরন্তু এই বৎসরের সর্ব্বপ্রধান ঘটনা হইতেছে ফ্রান্সে লুই নেপোলিয়নের রাজ্যভার গ্রহণ করা। তিনি সৈন্যসাহায্যে, এবং চতুরতা ও বিশ্বাসঘাতকতার দ্বারা ফরাসিগণকে মুগ্ধ করিয়া লুইফিলিপের পরিত্যক্ত শূন্য সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। ১৮৪৮ সনে বিপ্লবের পর ফরাসীদেশে সাধারণতন্ত্রের শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। কিন্তু সাধারণতন্ত্রের প্রধান ব্যক্তিগণ তেমন যোগ্য এবং পটু ছিলেন না। কাজেই তাঁহারা শাসনগুণে ফরাসীগণকে মুগ্ধ করিয়া রাখিতে পারেন নাই। লুই নেপোলিয়ন মহাবীর নাপোলিও বোনাপার্টির ভ্রাতুষ্পুত্র। প্রথমে ইনি জোর করিয়া ফরাসী সাধারণতন্ত্রের প্রধানপদ অধিকার করেন, পরে সে প্রধান্য যাবজ্জীবনব্যাপী বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিয়াছিলেন। সর্ব্বশেষে নিজকে সম্রাট বলিয়া জগতে প্রচার করিলেন।

১৮৫২ সালে বিলাতে অনেকগুলা দৈববিপদ ঘটিয়াছিল। "আমেজন" এবং "বর্কেনহেড" নামক দুইখানি জাহাজ সমুদ্রগর্ভে ডুবিয়া যায় এবং প্রায় এক হাজার জন ডুবিয়া মরে। বিলবরী জলের হাউজ ফাটিয়া গিয়া দুইটা গ্রাম ভাসিয়া গিয়াছিল। মহারাণী এই দুর্ঘটনায় বিশেষ ব্যথিত হইয়াছিলেন। চাঁদা করিয়া প্রায় দেড় লক্ষ টাকা জমা করিয়া গৃহদ্বারহীনগণের সাহায্য করা হইয়াছিল।

লণ্ডনের আমোদ-আহ্লাদে মত্ত হইয়া মহারাণীর স্বাস্থ্যভঙ্গ হইবার আশঙ্কায়, মাতুল লিওপোল্ড ইহাঁদিগকে স্থানান্তরে বেড়াইতে যাইতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। কিন্তু পূর্ব্ব হইতেই মহারাণী বড় সাবধান ছিলেন।

আগষ্ট মাসে মহারাণী বালমোরালে চলিয়া গেলেন। তথায় স্বামী-স্ত্রী বেশ সামান্য ব্যক্তির ন্যায় ঘর সংসার করিতেন। দুইজনে একসঙ্গে মাছ ধরিতেন, পাহাড়ের ধারে বেড়াইয়া বেড়াইতেন, একসঙ্গে খেলা করিতেন। সৈন্য সামন্ত লোক লস্কর কেহই কাছে থাকিত না। স্বামী-স্ত্রী দুইজনে সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাল-মোরাল গ্রামের সকল দীন-দরিদ্রগণের কুটীরে যাইতেন, তাহাদের দুঃখ কথা শুনিতেন এবং যতদূর সাধ্য, তাহা দূর করিবার চেষ্টা করিতেন।

একদিন দুইজনে ছদ্মবেশে দূরে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। পথে হঠাৎ বৃষ্টি আসিল। এমন কোন উপযুক্ত আশ্রয়স্থল ছিল না যে, বৃষ্টি হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। তবে অনতিদূরে এক অতি সামান্য কুটীর দেখিতে পাইয়া দুইজনে তাহার উদ্দেশে হাত ধরাধরি করিয়া দৌড়িলেন। অর্দ্ধ আর্দ্রবস্ত্রে দুইজনে বুড়ীর কুটীরে ঢুকিলেন। বুড়িত চটিয়াই লাল। এই দুর্যোগে আবার কে আসিয়া তাহার ক্ষুদ্র কুটীর জুড়িয়া বসিল! কিন্তু আলবার্ট ছাড়িবার পাত্র নহেন, তিনিত জোর করিয়া ভিক্টোরিয়াকে ঘরের মধ্যে বসাইয়া দিলেন। নিকটে আগুণ করিলেন এবং মহারাণীর আর্দ্রবস্ত্র শুকাইয়া দিলেন। কিন্তু বৃষ্টি আর থামে না, ক্রমশঃ অন্ধকার হইয়া আসিল। রাণীর একটু ভয় হইল। পথ চিনেন না, কোন্ দিকে আমোদের মুখে আসিয়া পড়িয়াছেন, তাহা ঠাওর নাই, এখন বাটী ফিরিবেন কেমন করিয়া? অথচ আলবার্টকে একলা যাইতে দেওয়া হইবে না, নিজেদের প্রকৃত পরিচয় দেওয়া হইবে না, বুড়ী মাগীর সঙ্গেও রঙ্গ করিতে হইবে। আলবার্টেরও মনে বেশ ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল; সঙ্গে কোন প্রকার অস্ত্র নাই, লাঠিগাছটিও ভাঙ্গিয়া গিয়াছে. পকেটে যা পয়সা ছিল খরচ হইয়া গিয়াছে, কোন উপায়ই নাই যাহাতে এ বিপদ হইতে উদ্ধার হন। এদিকে বুড়ী কিন্তু অনবরত ভ্যাজর ভ্যাজর

করিয়া বকিতেছিল; বকিতেও ছিল আর রাণীর সেবাও করিতেছিল। বুড়ী বলিল, "হাগা তুমি এ মিন্‌সের সহিত কেন বাহির হইয়া আসিলে? মিন্‌সেগুলা ভারি দুষ্ট? নিজে ষোল-আনা সুখটুকু লইবে, আর স্ত্রীলোককে কেবল কষ্টে ফেলিবে। আহা মা? তোমারই মত আমার একটী মেয়ে এক জাহাজী কাপ্তেনের সহিত কোথায় চলিয়া গিয়াছে। এ ছোড়াটা কি জাহাজের কাপ্তেন? হাগা তুমি কে?" ভিক্টোরিয়া মাগীর কথা শুনিতেছিলেন, আর টিপিটিপি হাসিতেছিলেন। এমন সময়ে দুই জন অশ্বারোহী সেই কুটীরে আসিয়া হাজির হইল। মহারাণীকে দেখিয়া তাহারা অভিবাদন করিয়া, সঙ্গে করিয়া লইয়া গেল। বুড়ী মাগী ত অবাক্ হইয়া রহিল।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

১৮৫২ সালে ১৬ই আগষ্ট তারিখে মহাবীর ডিউক ওয়েলিংটন দেহত্যাগ করিলেন; বিলাতের প্রধান বীর চলিয়া গেল।

এই বৎসরে মহারাণীর অষ্টম সন্তান এবং চতুর্থ পুত্র প্রিন্স লিওপোল্ড জন্ম-গ্রহণ করেন। বেলজিয়মরাজ-মাতুল লিওপোল্ডের নামে নবকুমারের নাম রাখা হইয়াছিল। এই বৎসর মহারাণী আর একবার আয়ারলণ্ড ডবলিন্ সহরে গিয়াছিলেন। লণ্ডনে ফিরিয়া আসিয়া শুনিলেন যে, য়ুরোপের পূর্ব্বপ্রান্তে মহারণের ঘনমেঘ দেখা দিয়াছে। রুষ এবং তুর্কীতে যুদ্ধ বাধিবার উদ্‌যোগ হইতেছে। ইংরেজ এবং ফরাসী-সম্রাট নেপোলিয়ন মধ্যে পড়িয়া তুর্কীকে রক্ষা করিতে চাহিলেন। কাজেই রুষকে ইংরেজ এবং ফরাসীগণের সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। এই মহাযুদ্ধকে ক্রিমীয় যুদ্ধ বলিয়া ইতিহাসে লিখিত হইয়াছে। রুষপক্ষে শেষে হার হয় এবং তুর্কীর স্বাধীনতা বজায় থাকে। এই যুদ্ধে ইংরেজ এবং ফরাসীগণ অদ্ভুত বীরত্ব দেখাইয়াছিলেন। বালাকলাভার যুদ্ধ, সিবাষ্টপলের অবরোধ, রেডানের আক্রমণ,—এই কয়টা ব্যাপারই

সেনাপতি সাজে মহারাণী।

ক্রিমীয় যুদ্ধের উল্লেখযোগ্য কাণ্ড। এই ক্রিমীয় যুদ্ধে মিস্‌মেরী নাইটিঙ্গেল স্কুটারিতে প্রকাণ্ড হাসপাতাল করিয়া আহত সেনাগণের সেবা করিয়াছিলেন। মিস নাইটিঙ্গেলের ন্যায় পরদুঃখকাতরা, শুশ্রূষাপরায়ণা রমণী খুব অল্পই পাওয়া যায়। এই যুদ্ধ-ব্যাপারে ইংরেজপক্ষে ব্যবস্থার অনেক ত্রুটি হইয়াছিল। সেনাগণের জন্যে বিলাত হইতে জুতা পাঠান হইয়াছে, কন্‌ট্রাক্টার জুতা সরবরাহ করিয়াছে ; কিন্তু সমরক্ষেত্রে সেনাগণ সেই জুতা পায় দিতে গিয়া দেখে, সবই একপায়ের জুতা ;—বামপায়ের পাটী। এই প্রকার নানারূপ বিশৃঙ্খলা হইয়াছিল।

মহারাণী এই যুদ্ধের সময়ে বিশেষ ব্যথিতা এবং উদ্বিগ্না থাকিতেন। কিসে সেনাগণ সুখে থাকে, কিসে তাহাদের আহারাচ্ছাদনের কোন কষ্ট না হয়, কিসে আহতগণের যথারীতি শুশ্রূষা হয়, মহারাণী অহরহ ইহাই ভাবিতেন, এবং যাহাতে সুব্যবস্থা হয়, তৎপ্রতি বিশেষ মনোযোগী থাকিতেন। রণক্ষেত্রে ইংরেজ-সেনাপতি লর্ড র‍্যাগলানকে মহারাণী লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। "সেনাপতি মহাশয় যেন বিশেষ দৃষ্টি রাখেন যে, তাঁহার অধীনস্থ সেনাগণের বৃথা কষ্টভোগ করিতে না হয়। সেনাগণ বৃথা এবং কেবল কষ্টভোগ করিতে থাকিলে মহারাণী বিশেষ ব্যথিতা হইবেন। অবশ্য যুদ্ধক্ষেত্রের অনিবার্য্য দুঃখ-কষ্ট যাহা হইবার, তাহা ত হইবেই। সেনাগণের অপরিণাম-দৃষ্টির জন্য যেন নূতন করিয়া দুঃখ সৃষ্ট না হয়।"

মহারাণীর নিকট হইতে এমন পত্র পাইয়া সেনাপতি-মহাশয়কে বিশেষ সাবধানে কাজ করিতে হইয়াছিল।

লর্ড এবারডীন যখন প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, তখন ক্রিমীয় যুদ্ধ আরম্ভ হয়। কিন্তু লর্ড পামার্ষ্টন যুদ্ধকার্য্য শেষ করেন। এই সময়ে হত সেনাগণের বিধবা পত্নী এবং অনাথ বালকগণের সাহায্য জন্যে লণ্ডন নগরে জলা-রঙ্গের ছবি বিক্রয় হয়। মহারাণীর পঞ্চদশবর্ষীয়া জ্যেষ্ঠা কন্যা একখানি ভাল ছবি আঁকিয়া বেচিবার জন্যে দিয়াছিলেন ; ঐ ছবিখানি ঢের দামে বিক্রয় হইয়াছিল।

ক্রিমীয় যুদ্ধাবসানে ফরাসীস সম্রাট ও সম্রাট পত্নী ইংলণ্ডে আসিয়াছিলেন সম্রাট নেপোলিয়নের ভ্রাতুষ্পুত্র লুই নেপোলিয়ন, মিত্রতাভিলাষী হইয়া যে ইংলণ্ডেশ্বরীর আতিথ্যস্বীকার করিবেন, ইহা কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই। মহাবীর নেপোলিয়ন ইংলণ্ডের চিরশত্রু ছিলেন; ইংলণ্ডেশ্বর তৃতীয় জর্জ্জের সহিত তিনি শেষ পর্য্যন্ত শত্রুতা করিতে ছাড়েন নাই। ওয়াটারলু-যুদ্ধক্ষেত্রে ইংরেজবীর ওয়েলিংটনই নেপোলিয়নকে পরাজিত করিয়াছিলেন। সেই মহাশত্রুর "ভাইপো" নেপোলিয়ন, তৃতীয় জর্জ্জের পৌত্রী রাজরাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার সাক্ষাৎকারে আসিবেন, ইহা এক প্রকার অপস্মার-স্বপ্ন বলিতে হইবে।

যাহা হউক সম্রাট আসিলেন,—তাঁহাকে সম্রাটোচিত আদর-অভ্যর্থনা করিয়া উইণ্ডসর রাজপ্রাসাদে আনয়ন করা হইল। মহারাণী ভিক্টোরিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া অগ্রসরবর্ত্তিনী হইয়া য়ুরোপের রাজোচিত ব্যবহারানুযায়ী সম্রাট নেপোলিয়নকে আলিঙ্গন করিলেন এবং দুই কপোলে দুইবার চুম্বন করিলেন। সম্রাট যথারীতি মহারাণীর করচুম্বন করিয়া আলিঙ্গনের প্রতিদান করিয়াছিলেন। এই চুম্বনের জন্য মহারাণীকে একটু নিন্দাভাজন হইতে হইয়াছিল। এই নেপোলিয়নের সঙ্গে নাচিতে নাচিতে মহারাণী বলিয়াছিলেন, "কি আশ্চর্য্য! আমি তৃতীয় জর্জ্জের পৌত্রী হইয়া ইংলণ্ডের প্রধান শত্রু বীর নেপোলিয়নের ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত ওয়াটারলু নামক গৃহে নৃত্য করিব! আর এই নেপোলিয়ন কিছুদিন পূর্ব্বে অতি দীনহীন দরিদ্রাবস্থায় ইংলণ্ডেই বাস করিতেছিল। তখন আমি কিন্তু রাজরাণী!" সফলকাম এবং কৃতকর্ম্মা পুরুষের সকল দোষই ঢাকিয়া যায়।

২১শে মে তারিখে মহারাণী লণ্ডন নগরের প্রধান সেনাবাস হর্স গার্ডসে গমন করিয়া বীর আহত সেনাগণকে বীরত্বের পারিতোষিকস্বরূপ স্মারক পদক স্বহস্তে দান করিয়াছিলেন। প্রত্যেক আহত সেনাকে ডাকিয়া মিষ্টকথায় সম্ভাষণ করিয়া মহারাণী সকলকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন।

এই বৎসর মহারাণী তাঁহার স্কটলণ্ডের গ্রীষ্মাবাস বালমোরালে যাইয়া

সংসারের এক প্রধান সুখে সুখী হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রথমা কন্যা এই সময়ে পঞ্চদশ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছিলেন। প্রুষিয়ার তখনকার রাজার ভ্রাতুষ্পুত্র প্রিন্স ফ্রেডরিক উইলিয়াম বিলাতে বেড়াইতে আসিয়াছিলেন। বেড়াইতে আসিয়া বিদেশে হৃদয়টী হারাইয়াছিলেন। মহারাণীর জ্যেষ্ঠা কন্যার নবযৌবনের নূতন জোয়ারে পড়িয়া ইনি আপনাহারা হইয়াছিলেন। মহারাণীকে বলিতে বাধ্য হইলেন যে, তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ-জামাতৃপদপ্রার্থী। সাংসারিক হিসাবে মেয়ের বিবাহ দেওয়া বড়সুখের কার্য্য। মহারাণী এতদিনে সেই সুখভাগিনী হইলেন। পনের বৎসরের কন্যার বিবাহ আজকাল বিলাতে ক্বচিৎ কদাচিৎ হইয়া থাকে। এখন "বাইশ" পার না হইলে বিবাহের ভাবনা ভামিনীগণের মাথায় আইসে না।

১৮৫৬ জানুয়ারী মাসে রুষের সঙ্গে সন্ধিকার্য্য শেষ হইল। এই বৎসরেই মহারাণীর পঞ্চমী কন্যা এবং শেষ বা নবম সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। ইহার নাম হয় প্রিন্সেস্ বিয়েট্রিস্। ইনি পরে ব্যাটেনবর্গের প্রিন্স হেনরীকে বিবাহ করেন। এখন বিধবাবস্থায় বিলাতে থাকিয়া বৃদ্ধা মাতার সেবা-শুশ্রূষা করিতেছেন।

ক্রিমীয় যুদ্ধের সময়েই মহারাণী ভিক্টোরিয়া সেনাগণের অদ্ভুত বীরত্বের পারিতোষিকস্বরূপ ভিক্টোরিয়া ক্রস নামক মর্য্যাদার এক নূতন শ্রেণী প্রচলিত করেন। যে সকল কামান ক্রিমীয় যুদ্ধে ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহার গোটাকয়েক লইয়া গালাইয়া ভিক্টোরিয়া ক্রস্ নির্ম্মিত হয়। ভিক্টোরিয়া ক্রস্ ইংরেজ-বীরগণের বড় আদরের সামগ্রী; ভিক্টোরিয়া ক্রস্ পাইলে ইংরেজ-বীর অপর সকল মান্যই তুচ্ছ করিতে পারে।

এই ক্রিমীয় যুদ্ধ-আতঙ্কের সময়ে বলণ্টিয়ার বা সখের সেনার সৃষ্টি হয়। বিলাতের যে-সে সখের সেনা হইয়াছিল। প্রথমে চার্টিষ্ট-বিদ্রোহকালে ইহার সূত্রপাত হইয়াছিল।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ইংলণ্ডের রাজরাণী হইয়া, ত্রিভুবনের ভাবনা মাথায় করিয়াও মহারাণী পুত্র-কন্যাগণকে যথারীতি প্রতিপালন করিতে ভুলেন নাই। তিনি নিত্য রাজকুমার ও রাজকুমারীদের পোষাক-পরিচ্ছদ দেখিতেন, নিত্য তাহাদের আহার পরিদর্শন করিতেন। এত দাস-দাসী,—এত চাকর-চাকরাণী ত ছিল, কিন্তু মহারাণী স্বয়ং ছেলে-মেয়েদের আহার-আচ্ছাদনের খোঁজ-খবর না লইলে, তাঁহার যেন নিদ্রা হইত না। তিনি নিজে ছেলে-মেয়েদের লেখা-পড়া কেমন হইতেছে তাহা দেখিতেন; নিজে অবকাশমত তাহাদের পড়াইতেন। যাহাতে ছেলেদের ধর্ম্মশিক্ষা ভাল হয়, যাহাতে ছেলেরা সৎস্বভাবান্বিত ও সাধুপ্রকৃতি হয়, অহরহ মহারাণীর এই চিন্তাই ছিল। কাহাকেও কখনও চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে দিতেন না। হয় খেলা কর, না হয় লেখাপড়া কর, এই হুকুম ছিল। যখন ছেলেরা অস্‌বরণ্ রাজপ্রাসাদে থাকিত, তখন মহারাণী এবং আলবার্ট ছেলেদের লইয়া অধিকক্ষণ অতিবাহিত করিতেন। আলবার্ট ছেলে ও মেয়ে কয়টীর একটী খেলনার বাগান তৈয়ার করিয়া দিয়াছিলেন। ছোট ছোট কোদাল, কুড়ুল এবং মালীর অন্যান্য যন্ত্র প্রত্যেক রাজকুমারের ব্যবহারের জন্যে খরিদ করিয়া রাখা থাকিত। তাঁহারা প্রত্যেকে লেখাপড়ার পর নিজের নিজের অংশে যাইয়া মাটী খুঁড়িতেন, কেয়ারী করিতেন, ফুল গাছের সেবা করিতেন, জমিতে সার দিতেন। হেড মালী এবং পরিদর্শকের কাজ করিতেন, স্বয়ং পিতা আলবার্ট। রাজকুমারগণ মহাস্ফূর্ত্তিতে পিতার পরিচালনাধীন থাকিয়া, মালীর কাজ শিখিতেন। এই মালিগিরির আবার পরীক্ষা ছিল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে, তাহার পারিতোষিক বিতরণ হইত। রাজবাটীর যে হেড মালী ছিল, সে আবার রাজকুমারগণের কাজের হিসাব রাখিত। কে কতটুকু মাটী খুঁড়ল, কয়টা গাছে জল দিল, কতটুকু জমির বন উপাড়াইল ইত্যাদির হিসাব দিত; সেই হিসাবমত প্রত্যেক

রাজকুমারকে মজুরি দেওয়া হইত। তাঁহারা মজুরির পয়সা পাইয়া নিজের নিজের বাগানের উন্নতি করিতেন।

এতদ্ব্যতীত ছুতোর এবং কামারের কাজ করিতেও রাজকুমারগণকে শিখান হইত। কেহ বাক্স গড়িতেন, কেহ চেয়ার তৈয়ার করিতেন, কেহ বা লোহা পিটিতেন। এই সকল সামান্য কাজ হইতে দুর্গ-নির্ম্মাণ কাজ পর্য্যন্ত রাজ-বালকগণকে শিখান হইয়াছে। তাঁহারা জুতো সেলাই করিতে জানেন, কাপড় সেলাই করিতে পারেন, বাগান কোপাইতে পারেন, বন্দুক ব্যবহার করিতে জানেন, ভীম দুর্গ-নির্ম্মাণ-কৌশলও শিখিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত প্রত্যেক বালকেই সাত আটটা ভাষা জানে, পৃথিবীর সকল দেশ ভ্রমণ করিয়াছে, বিজ্ঞান-রসায়ন, জীবতত্ত্ব, উদ্ভিদতত্ত্ব সকলই জানে। ব্যবহারে বালকগণ অতিশান্ত, বিনয়ী এবং কষ্ট-সহিষ্ণু। ইহাই ত প্রকৃত শিক্ষা!

রাজকুমারীগণের এই প্রকার শিক্ষার স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত ছিল। প্রত্যেক কন্যার ব্যবহার জন্যে এক একটী রান্নাঘর ছিল। সকালে লেখাপড়ার পর আহারাদি করিয়া নিজের নিজের রান্নাঘরে যাইয়া রন্ধন করিতে বসিতেন। যিনি যাহা রাঁধিবেন, তিনি অপরাহ্নে তাহাই খাইতে পাইবেন। যিনি রাঁধিতে পারিবেন না, তাঁহার আহার বন্ধ থাকিবে। একজন প্রধানা পাচিকা রাজ-কুমারীগণকে রান্না শিখাইতেন। প্রত্যহ মহারাণী এই ছেলেখেলা রান্নাঘরে আসিয়া কে কেমন রন্ধন কার্য্য শিখিতেছেন, তাহা পরিদর্শন করিয়া যাইতেন। সন্ধ্যার সময়ে যে রাজকুমারী হিসাবের চেয়ে অধিক রাঁধিতে পারিতেন, তাঁহাকে যথাযোগ্য পারিতোষিক দেওয়া হইত। একজন দরজী মেয়েদের কাপড় কাটিতে, শেলাই করিতে শিখাইত। যিনি ভাল গাউন তৈয়ার করিতেন, তিনি মহারাণীর নিকট হইতে তাহার দাম পাইতেন। মহারাণীর কন্যারা শেলাই করিতে, উল বুনিতে, ছবি আঁকিতে, পোষাক তৈয়ার করিতে, মূর্ত্তি গড়িতে, গান গাহিতে এবং রন্ধন করিতে খুব ভালই জানেন। রাজার মেয়ে হইলেও তাঁহারা স্বহস্তে রন্ধন করিয়া দশজনকে খাওয়াইতে বড়ই আনন্দ বোধ

করিয়া থাকেন। গৃহস্থালীর ত এত কর্ম্ম করিতে জানেন, আবার প্রত্যেক রাজকুমারীই বিদুষী, বহু ভাষাভিজ্ঞা, বহুবিদ্যা পারদর্শিনী। বলিয়া রাখা ভাল, মেয়েরা নভেল নাটক পড়িতে পাইতেন না, কেবল চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেও পাইতেন না।

শৈশবসুলভ দুষ্টামী যে ইহাঁদের মধ্যে ছিল না, তাহা নহে। দুষ্ট দুরন্ত সকলেই খুব ছিলেন। দুই একটা গল্প বলিব। একদিন একমাগী রাজবাড়ীর একটা উনানের উপর আলকাতরা মাখাইতেছিল, মহারাণীর বড় মেয়ে এবং যুবরাজ দুইজনে মিলিয়া সেই বুড়ী মাগীর মুখে আলকাতরা লাগাইয়া দিয়াছিলেন। আলবার্ট টের পাইয়া দুইজনকে খুব শাসন করিয়া দিয়াছিলেন এবং মাগীর নিকট যাইয়া ক্ষমা চাহিয়া আসিতে রাজকুমারী এবং যুবরাজকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। আমাদের যুবরাজ চিরকালই দুষ্টছেলে ছিলেন, কাহাকেও বড় মানিতেন না, তবে বাপ-মাকে বাঘের মত ভয় করিতেন। ক্রীমীয় যুদ্ধের পর যখন মহারাণী সেনাপতির পোষাকে সৈন্যপরিদর্শন করিতেছিলেন, তখন দুষ্ট ছেলে একজন সেনানায়কের মুখে থুতু দিয়াছিল, সেনানায়ক চিনিতে না পারিয়া এক থাবড়া বসাইয়া দিয়াছিল। মহারাণী এই ঘটনার কথা টের পাইয়া সেনানায়কের উপর অসন্তুষ্ট ত হন নাই, বরং বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। বড় মেয়ে "ভিকী" বড়ই লচপচে দুষ্টমেয়ে হইয়াছিল; একদিন মায়ে-ঝিয়ে বেড়াইতে যাইতেছেন। তের চৌদ্দ বৎসরের কন্যা সমভিব্যাহারী সেনানীগণের সহিত চাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়া ফাজলামি করিতেছিলেন। মহারাণী চোখ টিপিয়া, কটাক্ষ করিয়া কতমতে মেয়েকে সামলাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু দুষ্টমেয়ে মায়ের শাসন তখন শুনিল না। বরং ইচ্ছা করিয়া হাতের রুমাল ফেলিয়া দিল। অমনি পাঁচজন-যুবক পাঁচ দিক হইতে ঘোড়া হইতে নামিয়া রুমাল উঠাইয়া দিবার জন্যে প্রস্তুত হইল। মহারাণী রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "মহাশয়গণ! থামুন, আমার মেয়ে নিজেই পথে নামিয়া ধূলা হইতে রুমাল উঠাইবে। যাও, ভিকী রুমাল উঠাও।"

ভিকী কি করেন, ছোটমুখখানি করিয়া রুমাল উঠাইয়া আনিলেন। এতই শাসন ছিল, সংশিক্ষার প্রতি এতই খর-নজর ছিল। রাজার ছেলে হইলে যে, আদরের নিধি হইতে হইবে, ইহা মহারাণী কখনই বুঝেন নাই। যেমন সাধারণ লোকের ছেলে-মেয়ে লেখাপড়া শিখে, কাজকর্ম্ম শিখে, তেমনি ব্রিটনেশ্বরীর মেয়ে-ছেলে কাজকর্ম্ম লেখাপড়া শিখিয়াছে। মনে হয়, ইংলণ্ডেও এমন করিয়া কেহ কখন বালক-বালিকার শিক্ষা দিতে পারেন নাই। এই এই শিক্ষার গুণে মহারাণীর পুত্র কন্যা কেহই অসচ্চরিত্র, উদ্দাম-বিলাসী নহেন। এই শিক্ষার গুণে, এই জরাবস্থায় মহারাণী বালক-বালিকা লইয়া এত সুখে কালযাপন করিতেছেন। আহারবিষয়ে রাজকুমার ও রাজকুমারীগণের কখনও বাছাই-বিচার ছিল না। ভাল খাইব, ভাল পরিব, এ সাধ কখনও কাহারও নাই। সাদা-মাঠা আহার, সাদাসিধে পোষাক পরিয়া, ইংলণ্ডেশ্বরীর পুত্র-পুত্রীগণ সুখে নির্ব্বিঘ্নমনে থাকিতে পারিতেন।

আমাদের দেশের বাবুগণ এই বিষয় একটু লক্ষ্য করিলে ভাল হয়।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

২৫শে জানুয়ারী ১৮৫৮ সালে মহারাণীর বড়কন্যার বিবাহ হয়। এই বিবাহের দিন মহারাণী এবং আলবার্ট স্বামী-স্ত্রী খুব সাজিয়া গুজিয়া গির্জ্জাঘরে গিয়াছিলেন। মেয়ের বিবাহ, দুইজনেরই গালপোরা হাসি,—বুকভরা সুখ; কিন্তু তবুও যেন কেমন একটা বিষাদের কালছায়া হাসিমুখে আসিয়া পড়িতেছে। এত আদরের মেয়েকে যে বিবাহের সঙ্গে সঙ্গে বিদায় দিতে হইবে, এই কারণে উভয়েই ব্যথিত ছিলেন।

মহারাণী এই সময়েই ভারতের বিখ্যাত-মণি কোহিনুর পরিয়া আসিয়াছিলেন। মহারাণীর নিজের বিবাহব্যাপারে বোধ হয় এত ধূম হয় নাই; এবার তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহে যত ধূম হইয়াছিল। জামাই হইল

প্রাষিয়ার রাজার ভ্রাতুষ্পুত্র ; ভবিষ্যতে প্রাষিয়া-রাজ্যের উত্তরাধিকারী, য়ুরোপ প্রধান বল বলিয়া পরিচিত। কুলে শীলে মানে, যতদূর উচ্চ হইতে হয়, তাহা

২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে কন্যাকে শ্বশুরঘরে পাঠাইয়া দিলেন। সেই বর-কনে বিদায়ের দিন মহারাণী কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিলেন। অনেক কষ্টে তিনি আদরের মেয়েকে বিদায় দিয়াছিলেন। আলবার্ট এবং যুবরাজ "ভিকীকে" সঙ্গে করিয়া গ্রেভসেণ্ড নামক বন্দর পর্য্যন্ত পঁহুছিয়া দিয়া আসিয়া-ছিলেন।

এই বৎসর আগষ্টমাসে মহারাণী আলবার্টকে সঙ্গে লইয়া আর একবার ফ্রান্সে গিয়াছিলেন। তথায় নূতন ফরাসীস সম্রাট্ নেপোলিয়ন খুব আদর সম্মান করিয়া ইহাঁদের অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। যুবরাজ প্রিন্স ওয়েল্‌সও এইবার সঙ্গে ছিলেন। খুব নাচ-তামাসা আমোদ-আহ্লাদ করিয়া সকলে আবার বিলাতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।

সপ্তাহকয়েক বিলাতে বিশ্রাম করিয়া ইহাঁরা আবার য়ুরোপে ভ্রমণ করি-বার জন্যে বহির্গত হইলেন। ডসেলডর্ফ-নগরে যখন ছিলেন তখন আল-বার্ট সমাচার পাইলেন যে, তাঁহার পিতার আমলের বহুপুরাতন চাকর "কার্ট" মরিয়া গিয়াছে। এই দুঃখবার্ত্তা শুনিয়া আলবার্ট চক্ষের জল সামলাইয়া রাখিতে পারেন নাই। আট বৎসর বয়স হইতে "কার্ট" আলবার্টকে মানুষ করিয়াছিল। "কার্ট" ছায়ার ন্যায়, আলবার্টের অনুগমন করিত, পুত্রের ন্যায় আলবার্টকে ভালবাসিত,—আজ সেই কার্ট মরিয়া গেল। ইহ-সংসারে কার্টের মত সুখের সুখী, দুঃখের দুঃখী আলবার্টের আর কেহ ছিল না। প্রায় অষ্টাহকাল আলবার্ট কার্টের শোকে অভিভূত ছিলেন। দুই চক্ষের ধারায় তাঁহার বুকের কাপড় ভিজিয়া যাইত, "কার্ট" নাম করিতে তিনি আকুলপ্রাণে কাঁদিতেন। বড়কন্যা "ভিকী" আসিয়া বাপের কাছে দাঁড়াইলে পর, তবে আলবার্টের কার্টশোক কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইত। রেল ষ্টেসনে দাঁড়াইয়া একটি

ফুলের তোড়া হাতে করিয়া মহারাণীর গাড়ীতে আসিয়া রাজকুমারী পিতা মাতাকে বিশেষ সান্ত্বনা দিয়াছিলেন।

কন্যা যে গুর্ব্বিণী, এই সময়ে মহারাণী তাহা টের পাইলেন। এ সুখের সমাচার পাইয়াও কন্যার জন্যে বড়ই চিন্তিতা হইলেন। প্রসবকালে নিজে কাছে থাকিবেন, এই সাধ করিয়াছিলেন। কিসে মেয়েটিকে কাছে রাখিয়া খালাস করেন ইহার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রুসিয়া-রাজ্যের উত্তরাধিকারী জন্মগ্রহণ করিবে, রাজ্যের প্রধানগণ কি রাজকুমারীকে স্বতন্ত্র স্থানে থাকিতে দিতে পারেন—তাঁহাকে প্রুষিয়ারাজ্যেই প্রসব করিতে হইবে, প্রুষিয়-ভূমিতেই শিশু ভূমিষ্ঠ হইবে। এই সকল কথা শুনিয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি যে মা, মাতৃবেদনা যে কি, তাহাত আমি জানি, মা হওয়া যে কত কষ্টকর, তাহাও আমি জানি! মা আমার সন্তান প্রসব করিয়া আমাদের সকলকে আনন্দিত করিবেন বটে, কিন্তু সে ব্যাথার সময়ে যখন মা বলিয়া ডাকিবে, তখন আমি কোথায় থাকিব, আমি যে কাছে থাকিতে পারিব না!" মায়ের প্রাণ কি না, মহারাণী সকল বুঝিয়া যেন অবুঝের ন্যায় অনুরোধ উপরোধ করিয়াছিলেন। যাহা হউক ১৮৫৯ সালে ২৭শে জানুয়ারী তারিখে মহারাণীর প্রথম দৌহিত্রী জন্মগ্রহণ করিলেন। মহারাণীর যখন বয়স চল্লিশ, তখন তিনি দিদি-মা হইলেন; তাঁহার কন্যার তখন উনিশ বৎসর বয়স। এইবার আলবার্ট এবং মহারাণী বুড়া-বুড়ী সাজিলেন; দৌহিত্রী হইল।

সেই বৎসরেই জর্ম্মনির হেসিডার্ম্মষ্টাডের প্রিন্স লুই বিলাতে বেড়াইতে আসিলেন। আসিয়া তিনিও রাজকুমারী আলিসের প্রণয়ডোরে বাঁধা পড়িলেন। দুই যুবক-যুবতীতে পরামর্শ আঁটিয়া প্রীতির কথা মহারাণীকে গিয়া বলিলেন, অবশ্যই তিনি রাজি হইলেন। কিন্তু তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, দিন কয়েক আরও আলিসকে কাছে রাখেন। পরে বিধি বাদ সাধিয়া সেই ইচ্ছা পুরণ করিয়াছিলেন।

১৮৬১ সালে মহারাণী ও আলবার্ট তাঁহাদের বিবাহের একবিংশতি বৎসর পূর্ণ করিলেন। এই উপলক্ষে খুব পান-ভোজন হইয়াছিল। আমাদের যুবরাজ এই বৎসর ক্যাম্বিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন।

এই বৎসরই মহারাণী একটা বড় শোক পাইয়াছিলেন। তাঁহার মাতা ডচেসকেণ্ট ছেয়াত্তর বৎসরের বৃদ্ধা হইয়াছিলেন। তাঁহার শরীর জরাগ্রস্ত হইয়াছিল। তিনি যে আর অধিক দিন বাঁচিবেন না, তাহা সকলেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। বিশেষ বাম হস্তে এক অস্ত্র করা অবধি দিন দিন বৃদ্ধা অবসন্ন হইতেছিলেন। হঠাৎ একদিন তাঁহার কম্প দিয়া জ্বর আসিল। এই বিষম জ্বরের সমাচার পাইয়া মহারাণী অলবার্ট এবং রাজকুমারী আলিস তাড়াতাড়ি ফ্রগমোর গ্রামে চলিয়া গেলেন। সেই দিন সারারাত্রি মহারাণী মুমূর্ষু মাতার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া মায়ের সেবা করিয়াছিলেন। পরদিন প্রাতে ধীরে ধীরে বৃদ্ধা জননী ইহলোক ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। মহারাণী মায়ের হাতখানি ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন—কোথায় মা, কোথায় যাও মা বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। যে মা ভিক্টোরিয়ার পক্ষে একাধারে পিতা-মাতার ন্যায় ছিলেন, যে মা ভিক্টোরিয়ার মঙ্গল কামনা করিয়া জগৎ ভুলিয়া কন্যাকে প্রতিপালন করিয়াছিলেন, যে মা ভিক্টোরিয়াকে বুকে রাখিয়া সকল দুঃখ কষ্ট পাসরিয়াছিলেন, যে মা অসীম কষ্ট সহ্য করিয়া ভিক্টোরিয়াকে সৎশিক্ষা দিয়াছিলেন, আজ সেই মা চক্ষু বুজিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন। ভুবনেশ্বরী হইয়াও ভিক্টোরিয়া আজ সে মার হাত ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না—কেবল সামান্যার ন্যায় কাঁদিয়া বুক ভাসাইয়া দিলেন। আলবার্ট আসিয়া ধীরে ধীরে তাঁহাকে কোলে করিয়া কক্ষান্তরে লইয়া যাইতে চাহিলেন, কিন্তু ভিক্টোরিয়া বালিকার ন্যায় কাঁদিয়া আসিয়া আবার মৃতা-মাতার হাত ধরিলেন। "ভিকী'র নাম করিতে যে মায়ের মুখ দিয়া লালা গড়াইতে, স্নেহে চক্ষে জল আসিত, সেই মার দুই হাত ধরিয়া "ভিকী" কত কান্না কাঁদিল—মা কোন সাড়া-শব্দ

দিলেন না। ফুরাইল, জগন্মাতা ভিক্টোরিয়ার মা বলা এইবার ফুরাইল। ফুরাইল—ব্রিটনেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার মেয়ে সাজিয়া আদর দেখান আবদার করা এইবার ফুরাইল!!

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

এখন একবার ভারত ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতে হইবে।

ভীষণ আফগানযুদ্ধের পর, লর্ড এলেনবরা কিছু দেন বড়লাটের পদে অধিষ্টিত ছিলেন। গবালিয়রের বিপ্লব বিধ্বস্ত করিয়া তিনি বিলাত চলিয়া গেলেন। তাঁহার স্থানে বিখ্যাত যোদ্ধা সার হেনরী হার্ডিঞ্জ বড়লাট হইয়া আসিলেন। তিনি আসিয়াই পঞ্জাবের খালসা শিখগণের সহিত ভীষণযুদ্ধে লিপ্ত হইলেন। ইংরেজ-বিক্রমের সম্মুখে শিখগণ হটিয়া গেল। ইংরেজ লাহোর অধিকার করিলেন; কিন্তু বড়লাট হার্ডিঞ্জ শিখহস্ত হইতে পঞ্জাব প্রদেশ কাড়িয়া লইলেন না। দলিপ সিংহকে লাহোরের গদিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তথায় সার হেনরী লরেন্সকে রাজপ্রতিনিধিস্বরূপ রাখা হইল। লাট হার্ডিঞ্জ ভারতক্ষেত্রে শান্তি স্থাপন করিয়া বিলাত চলিয়া গেলেন। তাঁহার পর যুবক লর্ড ডালহৌসী বড়লাট হইয়া আসিলেন। রণজিৎ-রমণী রাণী চান্দকৌরের অত্যাচারে পীড়িত হইয়া খালসা শিখসেনা আবার ক্ষেপিয়া উঠিল। মূলতানে মূলরাজের বিপ্লব উঠিল; দুই জন ইংরেজ মারা পড়িল; দেশময় মহা হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। লাট ডালহৌসী পঞ্জাব আক্রমণ করিলেন। লর্ড গফ ইংরেজ-সেনার প্রধান নায়ক হইলেন। চিলিনবালার ঘোর যুদ্ধে ইংরেজকে কতকটা হটিতে হইয়াছিল। পরে গুজরাটের যুদ্ধে শিখশক্তিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া লর্ড ডালহৌসী পঞ্জাব প্রদেশ ইংরেজের অধিকারে আনিলেন।

লর্ড ডালহৌসী অযোধ্যার রাজা ওয়াজিদ আলি খাঁকে রাজ্যচ্যুত করিলেন, সতারার রাজ্য কাড়িয়া লইলেন, ঝান্সিরাজ্য ইংরেজরাজ্যের সামিল করিলেন। নাগপুর ভোঁসলাদের বিস্তীর্ণ রাজত্ব উপযুক্ত দত্তকে দিলেন না। ইনি কাড়িয়া কুড়াইয়া ইংরেজের রাজ্য প্রসার করিয়া চলিয়া গেলেন। ইহাঁর পর লর্ড কানিঙ বড়লাট হইয়া আসিলেন।

ভীষণ সিপাহীবিদ্রোহ লাট কানিঙের আমলে হয়। পৃথিবীতে বোধ হয় এমন রাষ্ট্রবিপ্লব কখনও হয় না। পৃথিবীতে বোধ হয়, এমন নিষ্ঠুরভাবে নর-নারীহত্যা কোন মনুষ্যেই ইতিপূর্ব্বে করে নাই। আ-হিমালয় কুমারিকা পর্য্যন্ত এই বিপ্লবে ভারতবর্ষ কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। ইংরেজের আধিপত্য যেন যায় যায় হইয়া উঠিয়াছিল। যাহা হউক, নারায়ণের কৃপায় সে বিপ্লব-দাবানল নিভিয়া গেল। দেশে শান্তি স্থাপিত হইল, এই বিপ্লবে ইংরেজের পক্ষে হ্যাভলক, আউটরাম, লর্ড ক্লাইব, রষ আদি মহাযোদ্ধার খুব যশঃসৌরভ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ইহাঁদেরই বীরত্বে এবং সার হেনরী লরেন্স ও সার জন-লরেন্সের ধীর-শাসন-গুণে ইংরেজ আবার ভারতবর্ষ ফিরিয়া পাইয়াছিলেন।

এতদিন ভারত-শাসন-ব্যবস্থা একদল ব্যবসাদার ইংরেজের হস্তে ন্যস্ত ছিল। এই বিপ্লবের পর, মহারাণী স্বয়ং ভারত-শাসনের ভার লইলেন। তিনি ভারত রাজ্যে খাসে লইবার সময়ে এক অপূর্ব্ব ঘোষণাপত্র প্রচারিত করিয়াছিলেন। কোন দেশের কোন বিজেতৃ-জাতির পক্ষ হইতে কখন এমন ঘোষণা-পত্র প্রকাশিত হইয়াছে কি না, আমরা জানি না। মহারাণী বলিয়াছিলেন যে, জাতি ধর্ম্ম এবং বর্ণনির্ব্বিশেষে গুণানুসারে ভারত শাসন-ব্যাপারে তিনি প্রজা ভারতবাসিগণকে সমান অধিকার দিবেন; কখনও কোন কারণেই কোন প্রজার ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিবেন না। আর যত বিপ্লবকারী সকলকেই ক্ষমা করিলেন।

এই ১৮৫৮ সালের ঘোষণা-বাণী ভারতবাসীর একমাত্র ভরসার স্থল, অন্ধের

যষ্টির ন্যায় হইয়া রহিয়াছে। রাজনীতিক অধিকার-প্রসার-কামনাদি যাহা কিছু, সকলই এই ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

ইহার পর হইতে ভারতের বড়লাটকে রাজপ্রতিনিধি আখ্যা দেওয়া হইল এবং ভারতবর্ষে তাঁহাকে রাজোচিত-সম্মান দেওয়া হইল।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

মানুষ যে ভবিষ্যৎ জানিতে পারে না, মানুষ যে ভাবী সুখ-দুঃখের কোন কথাই জানিতে পারে না, ইহা যে মনুষ্যমাত্রেরই পক্ষে কতটা মঙ্গলকর, তাহা আর বলিবার নহে। ব্রিটনেশ্বরী ত্রিভুবন-বিদিতা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার অদৃষ্টে যে কি আছে, তাহা যদি তিনি জানিতে পারিতেন, তাহা হইলে হয় ত রাজপাট ছাড়িয়া আলবার্টকে সঙ্গে লইয়া তিনি বনবাসিনী হইয়া থাকিতেন। কিন্তু মঙ্গলময় ভগবানের অপার করুণার জন্যে মানুষ ভাবিয়াও বিপদও জানিতে পারে না—মহারাণীও জানিতে পারিলেন না।

ইদানী আলবার্টের কেমন একরকম অম্লশূলের ন্যায় হইয়াছিল। মাঝে মাঝে ভয়ঙ্কর পেটে ব্যথা ধরিত, যন্ত্রণায় ছটফট করিতে হইত, পরে যা-তা ঔষধ দিয়া এক রকম করিয়া ব্যথাটা চাপিয়া রাখিতে হইত। আহার্য্য সামগ্রী কিছুই ভাল পরিপাক হইত না, দেহের বলও দিন দিন ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছিল।

অনেক প্রকারের বিপদ আলবার্টের মাথার উপর দিয়া গিয়াছে, ভগবানের কৃপায় সকলই কাটাইয়া উঠিয়াছিলেন। একদিন ঘোড়ায় চড়িয়া বেড়াইতে যাইতে যাইতে পথে ঘোড়া ভড়কিয়া যায়; এবং একটা বাগানের ভিতর দিয়া দৌড়িতে থাকে। হঠাৎ একটা গাছের ডালে মাথা ঠেকিয়া আলবার্ট পড়িয়া যান, তাই রক্ষা, নহিলে সেদিন প্রাণ দিতে হইত। আর একদিন কোবর্গের

ভড়কিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতে থাকে। সম্মুখে একটা রেল-লাইনের গেট বন্ধ ছিল—বোধ হয় ট্রেণ আসিতেছিল। সেই রেলের গেটে ধাক্কা লাগিবার পূর্ব্বেই আলবার্ট লাফাইয়া পড়েন। তাঁহার হাত পা, নাক কাটিয়া গিয়াছিল। কিন্তু অন্য কোন প্রকার সাংঘাতিক আঘাত পান নাই। একটা ঘোড়া মরিয়া যায়, বাকী তিনটা কোথায় পলাইয়া ছুটিয়া যায়। আলবার্টের ঘোড়া দেখিয়া কর্ণেল পনসনবী ছুটিয়া আইসেন; এবং প্রিন্সকে উঠাইয়া লইয়া যাইতে চাহেন। আলবার্ট বলেন যে, আমাকে লইয়া যাইবার পূর্ব্বে হতজ্ঞান কোচম্যানকে আগে লইয়া যাইতে হইবে। তাঁহার হুকুমমত প্রথমে কোচ-ম্যানকে, পরে তাঁহাকে লইয়া যাওয়া হইল। মহারাণী এই সমাচার পাইয়া, আলবার্টের মঙ্গলকামনায় ঈশ্বরের প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

কিন্তু আলবার্টের জন্যে এত মঙ্গলকামনা করিলেও, অমঙ্গলের ছায়া ধীরে ধীরে তাঁহার উপর আসিতেছিল। যাহা মনুষ্যদেহে সহে, তাহার অতিরিক্ত পরিশ্রম আলবার্টকে করিতে হইত। আলবার্ট রাজ্যের সকল রাজকার্য্য মহারাণীর পক্ষ হইতে করিতেন। "প্রিন্স কনসার্ট" উপাধি পাইয়া, মহারাণীর চিরস্থায়ী মন্ত্রিত্বে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ইহার উপর রাজসংসারের সকল ভার তাঁহার উপর ছিল। এতদ্ব্যতীত রাজ্যের অনেক বাজে কাজ তাঁহাকে করিতে হইত। মহারাণীর মাতা ডচেস্‌কেণ্ট মহারাণীকে সকল সম্পত্তি দিয়া গিয়াছিলেন, সেই সম্পত্তির সুব্যবস্থা করিবার ভার আলবার্টের উপর পড়িয়াছিল। আলবার্ট একা একশত হইয়া সকল কার্য্যই সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতেন। করিলে কি হইবে, দেহে যে এত পরিশ্রম সহিবার সামর্থ্য ছিল না! অম্লশূল, স্নায়ব-দৌর্ব্বল্য আদি দুরারোগ্য রোগ ধীরে ধীরে তাঁহাকে আসিয়া ধরিল। ধীরে ধীরে তিনি বল হারাইতে লাগিলেন, ধীরে ধীরে তাঁহার ক্ষুধা কমিতে লাগিল, ধীরে ধীরে অরুচি আসিয়া জুটিল। তাঁহার মহৎ দোষ ছিল, তিনি রোগকে বড়ই তুচ্ছ জ্ঞান করি-তেন। যৌবনকালে দেহ পুষ্ট বলিষ্ঠ ছিল বলিয়া কখনই অসুস্থতা গ্রাহ্য

করিতেন না। তা ছাড়া ইদানী তাঁহার কেমন একটা অবসাদ আসিয়া জুটিয়াছিল। কোন কাজই ভাল লাগিত না, কোন কিছুতেই মন লাগিত না। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন, "বাঁচিয়া থাকিতে আমার আর বাসনা নাই। তোমাদের বাঁচিবার বড় সাধ আছে আমার, কিন্তু জীবনে কোন ভরসাই নাই। আমি যদি ঠিক জানিতে পারি যে, আমি যাহাদের বড় ভালবাসি, তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ জন্যে সুবন্দোবস্ত হইয়াছে—তাহাদের ভবিষ্যতে কোন কষ্ট পাইবার সম্ভাবনা নাই; তাহা হইলে আমি হাসিতে হাসিতে মরিতে পারি।—কালই মরিতে পারি। নিজের সুখ—সুখের জন্যে আর বাঁচিতে ইচ্ছা করে না।" মহারাণী আলবার্টের এই কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন। মনে মনে স্বামীর মঙ্গল কামনা করিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এই কথা শুনিয়া অবধি মহারাণীর প্রাণটা কেমন সদাই হারাই হারাই করিত। কেমন যেন তিনি চমকিয়া উঠিতেন, আর মনকে প্রবোধ দিয়া আশ্বস্ত থাকিতেন। ভাবিতেন, ও সকল ভ্রমমাত্র, আলবার্ট আমার বেশ আছে; আমি রাক্ষসী কি দেখিতে কি দেখিতেছি। আলবার্ট ভালই থাকিবে,—ভালই আছে। ও কিছুই নহে, সামান্য দৌর্ব্বল্য-মাত্র। এই প্রকার নিজকে তাড়না করিয়া মহারাণী মনকে প্রবোধ দিতেন।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

দিন দিন আলবার্টের মেজাজটা কেমন চিড়চিড়ে হইয়া উঠিতে লাগিল; কোন কাজই ভাল লাগে না, কাহারও কথা মিষ্ট লাগে না,—সকল কথায় সকল বিষয়েই রাগ। লোকে আলবার্টের এমন ক্রোধ-প্রবণতা দেখিয়া বিস্মিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে একটু একগুঁয়ে জিদ্দি হইয়া উঠিলেন। যাহা করিবেন মনে করিতেন তাহা শত বাধা-বিঘ্নতেও করিতেনই। শরীর খারাপ, বাহিরে খুব শীত, তিনি সকলের মানা অগ্রাহ্য করিয়া সেনাগণের কুচকাওয়াজ দেখিতে গেলেন। শরীর

খুব দুর্ব্বল, তবুও তিনি উপাসনা-মন্দিরে উপাসনা করিতে গেলেন। সেখানে বার বার জানু পাতিয়া বসা এবং উঠা আর বহুক্ষণ একভাবে বসিয়া থাকাতে উহাঁর শরীর খারাপ হইল। ১লা ডিসেম্বর, ১৮৬১ সাল, প্রথম জ্বর দেখা দিল। সামান্য ঘুষ্ ঘুষে জ্বর; যেন নাড়ীতে ভাল পাওয়া যায় না। এই ঘুষঘুষুনি জ্বরের কথা শুনিয়া মহারাণীর প্রাণ কাঁপিয়া উঠিল। সেই সময়ে পর্ত্তুগাল দেশে বড়ই বাতশ্লেষ্মবিকার হইতেছিল; পর্ত্তুগালের রাজবংশের অনেকে এই বিকারে দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন। ভয়ে ভয়ে মহারাণী আলবার্টকে জিজ্ঞাসিলেন "তোমার কি জ্বর হইয়াছে? তিনি উত্তরে বলিলেন, 'না জ্বর নয়; জ্বর হইলে কি আর বাঁচিব?' মহারাণী ঈশ্বর স্মরণ করিয়া মনকে স্থির করিলেন। কিন্তু প্রধান মন্ত্রী লর্ড পামারষ্টনের মন কেমন শিহরিয়া উঠিল। তিনি আরও একজন ডাক্তার আনিয়া নিযুক্ত করিয়া দিলেন। ডাক্তার ত আসিতে লাগিল কিন্তু আলবার্টের জ্বর আর ছাড়ে না, অষ্টপ্রহর অল্পজ্বর থাকে। ক্ষুধামন্দা হইয়া গেল, সকল সামগ্রীতে অরুচি হইল, নিদ্রা কমিয়া গেল। তিনটী প্রধান দুর্লক্ষণ দেখা দিল। অনাহার বশতঃ দেহ খুব দুর্ব্বল হইয়া পড়িল; তিনি আর বিছানা ছাড়িয়া উঠিতে পারিলেন না। একেবারে শয্যাশায়ী হইলেন। ডাক্তারগণ বুঝিলেন, ব্যাপার মন্দ, অল্পজ্বর এবং আহার বন্ধ থাকিলে শিব সাক্ষাৎ হইলেও রোগ আরাম করিতে পারিবে না।

এই সময়ে আলবার্ট, কন্যা আলিসকে কাছে রাখিতেন। রাজকুমারী পিতাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্যে নানাপ্রকারের পুস্তক পাঠ করিয়া শুনাইতেন, কত গল্প করিতেন, কত মজার মজার কথা কহিতেন। এবং ছোট ছেলেটিকে যেমন ভুলাইয়া রাখে তেমনি ভুলাইয়া পিতাকে আলিস্ খাইতে দিতেন। আলবার্ট ছোট ছেলেটির মত আলিসের কাছে আবদার করিতেন। এতদিন আলবার্ট নিজের পোষাক খুলেন নাই, কাহাকেও খুলিতেও দেন নাই আলিসই মিষ্ট কথা কহিয়া বাপের গায়ের কাপড় খোলাইয়াছিলেন। ৮ই ডিসেম্বর তারিখে আলবার্টকে একটা বড়ঘরে লইয়া যাওয়া হইল। এমনি

শেষ শয্যা—পিতা ও পুত্রী।

দৈবের ব্যবস্থা যে, এই ঘরেই রাজা চতুর্থ উইলিয়ম এবং চতুর্থ জর্জ্জ দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। একটা পিয়ানো আনিয়া সেই ঘরে রাখা হইল। আলিস্ বাপের হুকুমমত ধর্ম্ম সঙ্গীত গান করিয়া পিতাকে সন্তুষ্ট রাখিতেন। নিশিদিন পিতার কাছে থাকিয়া পিতার সেবা করিয়া আলিস্ কখনও কষ্টবোধ করিতেন না, কখনও অবসন্ন হইতেন না।

রবিবার আসিল।—ইহজগতে আলবার্টের শেষ রবিবার আসিল। সেই রবিবার দিন আর সকলে ত ভগবানের উপাসনায় গির্জ্জায় চলিয়া গেল। আলবার্ট আলিস্‌কে বলিলেন "মা, আমার বিছানাটা একবার জানালার কাছে ঠেলিয়া লইয়া যাও। আমি একবার আকাশ দেখিব—সেই আকাশে সাদা সাদা মেঘ কেমন ভাসিয়া যাইতেছে, তাহাই দেখিব। ও নীল আকাশ আর যে দেখিতে পাইব না, ও সোণার বরণ সূর্য্যকিরণ আর যে চক্ষের উপর ঝলসিবে না, ওই আকাশের কোলে ছোট ছোট পাখিগুলির মধুর শব্দ আর যে কর্ণকে পরিতৃপ্ত করিবে না। দেও মা, জন্মের সাধ আকাশ দেখিতে আমাকে জানালার কাছে সরাইয়া দেও।" পিতার এমন কথা শুনিয়া আলিস্ কাঁদিয়া ফেলিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে পিতার শয্যা ঠেলিয়া জানালার কাছে রাখিলেন। ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া খোলা জানালার পথে অনন্ত অসীম নীল আকাশ দেখিয়া আলবার্ট দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন। এবং কাতরমুখে বলিলেন, "মা! একবার গান গাও, তোমার মধুর কণ্ঠে ঈশ্বরস্তুতিমূলক গান গাও। আমি কাণে ভগবানের নাম শুনি; চক্ষে আকাশপটে ভগবানের অপরূপ রূপ দেখি।" আলিস গান গাহিতে লাগিলেন, আলবার্ট চক্ষুদুইটি ধীরে ধীরে মুদিত করিয়া করযোড়ে দেবাদিদেবের উপাসনায় রত হইলেন। আলিস গান শেষ করিয়া দেখেন, আলবার্ট চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নিবাত-নিষ্কম্পবৎ স্থির হইয়া আছেন। আলিস ভাবিলেন, পিতা বুঝি ঘুমাইয়াছেন। যেমনি উঠিয়া কাছে গিয়া দেখিতে গেলেন, অমনি আলবার্ট পদশব্দ শুনিয়া ম্লানমুখে একটু হাসিয়া আলিসের দিকে তাকাইলেন। "তুমি কি ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলে বাবা!"

আলবার্ট হাসিয়া বলিলেন,—"না মা, আমি ঘুমাই নাই,—কেবল ভাবিতেছিলাম,—কত সুখের ভাবনা ভাবিতেছিলাম।"

মহারাণী অষ্টপ্রহর আলবার্টের কাছে আসিতেন; কিন্তু সেবার ভার উপযুক্ত কন্যাই লইয়াছিলেন। তাঁহাকে আর স্বামী-সেবা করিতে হইত না। তবে তিনি বিছানার উপর বসিয়া ধীরে ধীরে আলবার্টের মাথার চুল কুলাইয়া দিতেন, পিঠে হাত বুলাইয়া দিতেন। একটু আধটু সেবা-শুশ্রূষা করিতেও ছাড়িতেন না। আলিস বাহিরে গেলে ভিক্টোরিয়া স্বয়ং রোগীর সেবা করিতেন, আর কাহাকেও ছুঁইতে দিতেন না।

রোগ কিন্তু কিছুতেই প্রশমিত হইল না। ধীরে ধীরে বিকারের সকল লক্ষণ পরিস্ফুট হইল। আরও দুইজন বড় ডাক্তারকে চিকিৎসার জন্মে আনা হইল; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না।

আলবার্টের কেমন যেন শয্যাকণ্টক হইল। বিছানায় শুইয়া যেন স্থির থাকিতে পারিতেন না। কেবল ভিক্টোরিয়া কাছে থাকিলে চুপ করিয়া থাকিতেন। ভিক্টোরিয়ার গালে হাত দিতেন, চুল হাতে হাতে জড়াইতেন, আর ধীরে ধীরে বলিতেন,—"আমার সাধের সঙ্গিনী, আমার সুখের স্ত্রী।" ভিক্টোরিয়া স্বামীর শয্যাপার্শ্বে বসিয়া, কাঁদিতে পারিতেন না; রোগীকে স্থির রাখিবার জন্মে শুষ্কমুখে হাসিতেন।

১২ই ডিসেম্বর তারিখে শ্বাসের মত লক্ষণ হইল। ১৩ই প্রাতঃকালে ডাক্তার জেনার আর মহারাণীর নিকট হইতে ঢাকিয়া রাখিতে পারিলেন না, যে রোগ একরকম দুরারোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। ভিক্টোরিয়া ছুটিয়া গিয়া স্বামীর শয্যাপার্শ্বে হাজির হইলেন, দেখেন, আলবার্টের মুখ পাঙ্গাসবর্ণ হইয়া গিয়াছে, মৃত্যুর কালিমা-রেখা যেন ধীরে ধীরে চক্ষের কোণে আসিয়া পড়িতেছে। মহারাণী সকল ছাড়িয়া স্বামী-পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন। ছেলেরা সকলে একে একে পিতার কাছে আসিল; মুমূর্ষু পিতার হস্ত-চুম্বন করিল, বুকে হাত দিল, মুখে কচি কচি হাতগুলি বুলাইয়া দিল; মহাঘোরে পতিত

আলবার্ট তাহার কিছু বুঝিতে পারিলেন না। এই সময়ে প্রলাপ-উক্তিও আরম্ভ হইল, চক্ষু-দুইটি শিবনেত্র হইল। কেবল মহারাণী যখন আছাড়িয়া গিয়া আলবার্টকে জড়াইয়া ধরিয়া "কোথা যাও আমাকে একলা ফেলিয়া কোথা যাও।" তখনই আলবার্ট একটু হাসিয়া চক্ষু খুলিয়াছিলেন। মহারাণী বলিলেন,—"আমি তোমার আদরের ভিক্টোরিয়া, আমাকে চিনিতে পারিতেছ কি?" ম্লান-মুখে শেষ হাসি হাসিয়া আলবার্ট মহারাণীর গায়ের উপর ঢলিয়া পড়িলেন এবং ধীরে ধীরে কপোলে একটি চুম্বন দিলেন।

আলবার্ট এই সময়ে খুব ঘামিতে লাগিলেন—এ যে মৃত্যুর ঘাম, তাহা সকলেই বুঝিলেন। মহারাণী ভাবিলেন, বুঝি বা জ্বর ছাড়িতেছে। শেষে যখন দেখিলেন, সময় নিকট হইয়া আসিল তখন আলবার্টের হাত দুইখানি ধরিয়া ঊর্দ্ধনেত্রে ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন। ভগবানের সুধামাখা নাম শুনিতে শুনিতে ধীরে ধীরে আলবার্টের জীবন-প্রদীপ নিবিয়া গেল।

তেতাল্লিশ বৎসর বয়সে আলবার্ট চলিয়া গেলেন। এত আদরের ভিক্টোরিয়াকে একা রাখিয়া, ছেলেমেয়েগুলিকে অনাথ করিয়া, দেশের লোককে কাঁদাইয়া দেবতার স্বরূপ আলবার্ট চলিয়া গেলেন। আর আসিবেন না, আর হাসিবেন না, আর পুত্রকন্যাদের লইয়া আমোদ-প্রমোদ করিবেন না। ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রাণবল্লভ হইয়াও মৃত্যুর হাত এড়াইতে পারিলেন না—চলিয়া গেলেন। আমাদের চিরসুখিনী, আদরিণী মহারাণী বিষম বৈধব্যের লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলেন।

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

সব ফুরাইল;—ইহসংসারের সকল সুখের সু-স্বপ্ন এইবার ভাঙ্গিয়া গেল। যাহাকে লইয়া সুখ, যাহার জন্যে সুখ, মহারাণীর তাহাই ঘুচিয়া গেল। রাজ্যেশ্বরী হইয়াও তিনি বিধবা হইলেন। সকল সুখের সুখী হইয়াও তিনি সকল বিষয়ে বঞ্চিত হইলেন।

২৩শে ডিবেম্বর তারিখে আলবার্টের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হইল। যেখানে ইংলণ্ডের সকল রাজার সমাধি হইয়া থাকে, সেইখানে মৃতদেহ বহন করিয়া লইয়া যাওয়া হইল। আমাদের যুবরাজ প্রিন্স ওয়েল্‌স আর ভাই আর্থারকে সঙ্গে করিয়া পিছনে পিছনে যাইতে লাগিলেন। কিন্তু দুইভাইই কাঁদিতে কাঁদিতে যাইতেছিলেন। রাজার ছেলেদের এমন কান্না দেখিয়া পথের লোকে কাঁদিয়া অস্থির হইয়াছিল। যখন উপাসনা হইতেছিল, তখন দুই ভাই দুই-জনের গলা জড়াইয়া ধরিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছিলেন। কেহই কাহাকেও সান্ত্বনা করিতে পারিতেছিল না। শেষে যখন উপাসনাদি শেষ হইল; লাসের বাক্স কবরে নামাইয়া দিতে লাগিল, তখন দেশের রীতি অনুযায়ী যুব-রাজকে একমুষ্টি মৃত্তিকা বাক্সের উপর ফেলিয়া দিতে হইয়াছিল। এই মৃত্তিকা ফেলিবার সময়ে যুবরাজ একেবারে আত্মহারা হইয়াছিলেন! তাঁহাদের দুই ভাইকে বাটী ফিরাইয়া আনা ভার হইয়াছিল। শেষে কোনমতে বালক-দুইটি ঘরে আসিলে, মহারাণী পিতৃহীন দুই ছেলেকে বুকে করিয়া কেবল কাঁদিয়া-ছিলেন। এক একবার কাঁদিয়া বলিয়া উঠিতেন, "আমাকে 'ভিক্টোরিয়া' বলিবার আর কেহ রহিল না। মা গেল, স্বামীও চলিয়া গেলেন—বাল্যের এবং যৌব-নের সকল সঙ্গীই চলিয়া গেল।"

এই সময়ে "হার্টলী" কয়লার খনিতে চাপা পড়িয়া দুই শত চারিজন মারা পড়ে। মহারাণী লিখিয়াছিলেন, অনাথ বালক-বালিকা এবং বিধবা কামিনী-গণের দুঃখ এখন অমি যত বুঝিতে পারিব, এত আর কেহ বুঝিবে না।

এই সময় হইতেই মহারাণীর সুখের সংসারে শোকের ছায়া আসিয়া পড়িল। একে একে অনেকগুলি চলিয়া গেল।

রাজকুমারী আলিসের বিবাহ, পরবৎসর একরকম করিয়া শেষ করা হইল। মহারাণী কন্যানসম্প্রদানকালে উপস্থিত ছিলেন। যখন ভাসুর সাক্স কোবর্গের ডিউক আর্ণেষ্ট কন্যা সম্প্রদান করিলেন, তখন মহারাণী কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন

রাজরাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়া

একোনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

সংসারে থাকিতে হইলে সকল শোকই ঢাকিয়া যায়। একপুত্রের শোক ভুলিয়া থাকা চলে—স্বামি-বিরহ-শোকও সামলাইতে হয়! মহারাণীও মনের ভিতরের সকল আগুন মনে চাপিয়া যথারীতি রাজকার্য্য করিতে লাগিলেন।

কিন্তু একটা বড় সুখের ঘটনা এই সময়ে হইল। জ্যেষ্ঠপুত্র রাজ্যাধিকারী প্রিন্স ওয়েলস্ মনোমত কামিনী বাছিয়া আসিয়াছিলেন। ডেন্মার্কের রাজার কন্যা রাজকুমারী অলেকজাণ্ড্রা অতিশয় রূপবতী বলিয়া বিখ্যাত। তেমন লাবণ্যপ্রভা, তেমন সৌন্দর্য্যচ্ছটা সে সময়ে বুঝি য়ুরোপের কোন যুবতীরই ছিল না। সেই অপরূপ-সুন্দরী আলেকজাণ্ড্রাকে, বিবাহ করিবার জন্যে যুবরাজ বিলাতে আনিলেন। আলবার্ট বাঁচিয়া থাকিতে এই প্রণয়ের কথা শুনিয়াছিলেন, এবং এই খানেই ছেলের বিবাহ দিবেন স্থির করিয়াছিলেন।

আলেকজাণ্ড্রা রাজকুমারী বিলাতে আসিলেন; বিলাতের লোক মহা ধূমধামে বিশেষ আগ্রহের সহিত তাঁহাকে গ্রহণ করিল। মহারাণী নববধূ পাইয়া সকল শোক পাসরিয়া গেলেন। একটু যেন সুখী হইলেন।

কিন্তু যেদিন বিবাহ হয়, সেদিন যুবরাজকে একলা দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া মহারাণী কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন। আজ পিতা আলবার্ট বাঁচিয়া থাকিলে তিনিই পুত্রের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সকল কার্য্য করিতেন। ইংলণ্ডের যুবরাজ অনাথের ন্যায় একলাটী কন্যা গ্রহণ করিলেন। ইহা দেখিয়া মহারাণীর অন্য সকল পুত্র-কন্যারা হাতের ফুলের তোড়ার মধ্যে মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়াছিলেন। পাছে অমঙ্গল হয়, এই ভাবিয়া, মহারাণী কষ্টে চক্ষের জল সামলাইয়া রাখিয়াছিলেন।

বিবাহ হইয়া গেল। যুবরাজ পত্নী লইয়া অস্‌বর্ণের বাটীতে “মধুচন্দ্র”

কাটাইবার জন্যে চলিয়া গেলেন। বিলাতের সকল প্রধান নগরই আলোক-মালায় সজ্জিত হইয়াছিল।

ইংলণ্ডের রীতী অনুসারে এখন যুবরাজ আর মায়ের কাছে থাকিতে পারেন না। পরিবার লইয়া স্বতন্ত্র থাকিবার উদ্যোগ করিলেন। লণ্ডন সহরে মার্লবরো প্রাসাদে তিনি থাকিবেন; এবং গ্রামে থাকিতে হইলে স্যাণ্ডিংহামে থাকবেন।

এই সময়ে ফ্রগমোর নামক স্থানে আলবার্টের স্মরণচিহ্নস্বরূপ এক অপূর্ব্ব সমাধিমন্দির তৈয়ার করান হইয়াছিল। এই বাটী নির্ম্মাণ করিতে প্রায় চল্লিশ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। মহারাণী প্রত্যেক বৎসরে ডিসেম্বর মাসে এই সমাধিমন্দিরে যাইয়া আলবার্টের উদ্দেশে উপাসনাদি করিয়া থাকেন। তিনি যে দিন মরিয়াছিলেন, রাজসংসারে সেদিন কেহ কোন কাজ করিতে পায় না।

৮ ই জানুয়ারী ১৮৬৪ সালে যুবরাজপত্নী আলেকজাণ্ড্রার হঠাৎ গর্ভবেদনা হইল। তিনিগুর্ব্বিণী ছিলেন, কিন্তু মার্চ্চের পূর্ব্বে পুত্রপ্রসবের কোন সম্ভাবনা নাই জানিয়া, প্রসূতিযোগ্য কোন ব্যবস্থাই হয় নাই। যাহা হউক রাজকুমারী পুত্র প্রসব করিলেন। আটাশে ছেলে বলিয়া পাছে কিছু মন্দ হয় এইভয়ে, মহারাণী স্বয়ং নবকুমার পৌত্রের শুশ্রূষা করিয়া বাঁচাইয়াছিলেন। ছেলেটী বাঁচিয়াছিল। মহারাণী পৌত্রমুখ এত শীঘ্র দেখিতে পাইবেন তাহা তিনি মনেও করেন নাই। পৌত্রমুখ দেখিয়া তিনি সকল শোক ভুলিলেন। পৌত্রের নাম রাখিলেন প্রিন্স আলবার্ট ভিক্টর। কিন্তু দৈবের এমনি কঠোর লিখন, মহারাণীর এত কষ্টের পৌত্র আলবার্ট, পরে মহারাণীকে রাখিয়া ইহসংসার ত্যাগ করিয়া গেল।

১৮৬৫ সালে ৯ই ডিসেম্বর তারিখে মহারাণীর মামা বেলজিয়মের রাজা লিওপোল্ড দেহ ত্যাগ করেন। তখন তাঁহার বয়স হইয়াছিল ছেয়াত্তর বৎসর। মহারাণী মাতুল-শোকে একপ্রকার অবসন্ন হইয়াছিলেন।

বেলজিয়মরাজ লিওপোল্ড।

বেলজিয়মের রাজা লিওপোল্ড আমাদের মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মাতুল। উনি ভাল লেখা পড়া শিখিয়া রুষিয়ার সৈন্যের একজন সেনাপাত নিযুক্ত হইয়াছিলেন; এবং লটজেন, বটজেনের মহাযুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। এই যুদ্ধে মহাবীর নেপোলিয়ন জয়ী হইয়াছিলেন। ১৮২০ সালে তিনি ইংলণ্ডে আসিয়া রাজকুমারী সারলটের প্রণয়ভাজন হইয়াছিলেন, পরে তাঁহারই পাণিগ্রহণ করেন। রাজনন্দিনী সারলট ইংলণ্ডের রাজদুহিতা ছিলেন এবং রাজ্যের উত্তরাধিকারিণী ছিলেন। সুতরাং এই বিবাহে লিওপোল্ডের ভবিষ্যতে ইংলণ্ডের রাজা হইবার আশা হইয়াছিল। রাজকুমারী সারলট, কিন্তু ১৮২৭ সালে দেহত্যাগ করেন; এবং ইহার বার বৎসর পরে লিওপোল্ড লুকাইয়া, কেবল ভালবাসার খাতিরে নিজপদমর্য্যাদা ভুলিয়া কেরোলাইন

মনোনীত হন। ইনিই রাজকুমার আলবার্টের সহিত আমাদের মহারাণীর শুভ বিবাহ ঘটাইয়াছিলেন। পদমর্য্যাদা হিসাবে আলবার্ট ইংলণ্ডেশ্বরীর সমকক্ষ ছিলেন না; কাজেই মর্য্যাদার খাতির করিলে এ বিবাহ হইত না। লিওপোল্ড কিশোর-কিশোরী ভাই-ভগিনীকে একত্র করিয়া, প্রণয়ের সঞ্চার করিয়া দিয়া, উভয়কে প্রেমের হারে বাঁধিয়াছিলেন। ভালই করিয়াছিলেন।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

আলবার্টের মৃত্যুর পর মহারাণী কোন সাধারণ কার্য্যে লিপ্ত থাকেন নাই। কখনও বাহিরে বেড়াইতেও যাইতেন না। পরন্তু ১৮৬৬ সালে তিনি স্বয়ং পার্লামেণ্ট খুলিয়া আদেশবাণী পাঠ করিয়াছিলেন।

২০শে মে তারিখে তিনি কেনসিংটন গোরে শিল্প এবং বিজ্ঞানের ভবন প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই ভবনের নাম "আলবার্টহল" রাখিয়াছেন। আলবার্ট নাই, আলবার্টের হইয়া যুবরাজ সকল কার্য্য করিয়াছিলেন। মহারাণী বলিয়াছিলেন যে, এখন কার্য্যে মন স্থির রাখা আমার পক্ষে অসম্ভব। তবে "তিনি" যাহার জন্যে চিরজীবন পরিশ্রম করিয়াছিলেন; সেই কার্য্য আজ সম্পূর্ণ হইল বলিয়া আমি তাঁহারই স্মৃতিচিহ্ন চিরস্থায়ী করিবার জন্যে আসিয়াছি।

এই সময়ে প্রুষীয়ার মহারাণী বিলাতে আসিয়াছিলেন। তুর্ক সুলতানও আসিয়াছিলেন। সুলতানকে লইয়া বিলাতের লোক খুব আমোদ আহ্লাদ করিয়াছিল। সুলতান চলিয়া গেলে, মহারাণী আলবার্টের জীবনচরিত-মূলক এক খানি পুস্তক লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে চারলস্ ডিকেন্স বিলাতের বিখ্যাত লেখক। মহারাণী নিজের একখানি পুস্তক চারলস্ ডিকেন্সকে উপহার দিয়া লিখিয়াছিলেন;—"বিলাতের অতি সামান্য লেখিকার নিকট হইতে প্রধান লেখককে উপহার প্রেরিত হইল।"

১৮৭১ সালে যুবরাজের বিষম পীড়া হইয়াছিল। প্রাণের কোন আশাই ছিল না। শেষে ভগবানের কৃপায়, কোনক্রমে যুবরাজ আরোগ্য লাভ করিয়াছিলেন। একচল্লিশ দিন বিষম রোগশয্যায় যুবরাজ অজ্ঞান হইয়া ছিলেন। যে ব্যারামে পিতা আলবার্ট দেহত্যাগ করিয়াছিলেন; জ্যেষ্ঠ পুত্রেরও ঠিক সেই ব্যারামই হইয়াছিল। যাহা হউক বহুকষ্টে ও চিকিৎসার গুণে যুবরাজ আরোগ্য লাভ করিলেন। মহারাণী পুত্র কন্যা পুত্রবধূ সঙ্গে লইয়া গির্জ্জায় যাইয়া ঈশ্বর-উপাসনা করিয়াছিলেন। সমগ্র ইংলণ্ডবাসী যুবরাজের মঙ্গলকামনায় ঈশ্বর-উপাসনা করিয়াছিলেন।

সেই উপাসনার দিন ইংলণ্ডের সকল কার্য্যই বন্ধ ছিল। সে দিন সকলের আনন্দ-উৎসবের জন্য ছুটি ছিল।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

ফরাসীস সম্রাট্ নেপোলিয়ন এই সময়ে বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ফরাসীসদের দৃষ্টিতে তাঁহার আর তেমন সম্ভ্রম মর্য্যাদা রহিল না। তিনি মনে করিলেন, এক বড় যুদ্ধে জয়ী হইতে পারিলে হয় ত তিনি আবার নিজের মান সম্ভ্রম বাড়াইতে পারিবেন। যুদ্ধে যে পরাজয়ও আছে, তাহা তিনি তখন মদগৌরবে বুঝিতে পারেন নাই। যুদ্ধে পরাজিত হইলে তাঁহার যে সকল আশা ভরসা শেষ হইবে, পরে কখনও তাঁহার বংশের কেহই ফরাসী রাজ সিংহাসনে বসিতে পারিবে না, তাহা তিনি স্বপ্নেও মনে করিতে পারেন নাই।

হয়েনজলেরণবংশের প্রিন্স লিওপোল্ডকে স্পেনদেশের রাজসিংহাসন দিবার কথা হয়। স্পেনীয় রাণী ইসাবেলা রাজ্যভার ত্যাগ করাতে এই ব্যবস্থার কথা উঠে। কিন্তু ফরাসী-সম্রাট্ এই সমাচার পাইয়া ইহার বিরোধী

হইলেন। বিরোধের কথা শুনিয়া প্রিন্স লিওপোল্ড স্পেনদেশে যাইবার বাসনা ত্যাগ করিলেন। কিন্তু নেপোলিয়ন বলিলেন যে, ভবিষ্যতে কখনও লিওপোল্ড স্পেন-রাজ্যাদির জন্যে চেষ্টাবান হইবেন না—এমন প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে। প্রুষিয়রাজ উইল-হেল্‌ম বুঝিলেন, যুদ্ধ অনিবার্য্য। তিনি যুদ্ধেই মন দিলেন। ফরাসীসগণ বিশেষ উৎসাহের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত হইলেন। কিন্তু ফরাসীসগণের দৈব বিরোধে ছিল। গ্রেভলোট, সেডান, ওয়ার্থ, মেটজ আদি স্থানের ভীমযুদ্ধে ফরাসী শক্তি একবারে পর্য্যুদস্ত হইয়া গেল। রাজনগরী পারী শত্রুহস্তে পতিত হইল। সম্রাট্ নেপোলিয়ন বন্দী হইলেন। সম্রাট্‌পত্নী ইউজিনী পুত্র সঙ্গে করিয়া ইংলণ্ডে পলাইলেন। কিছু দিনের পর সম্রাট্ নেপোলিয়ন দুঃখে কষ্টে দেহ ত্যাগ করিলেন।

এই ভীষণ যুদ্ধে জর্ম্মণ পক্ষ হইতে জেনারল ভন গবেন, ভন মণ্টকী প্রিন্স ফ্রেডরিক চার্লস, জেনারল ব্লুমেন্থাল এবং মহারাণীর জ্যেষ্ঠ জামাতা যুবরাজ ফ্রেডরিক উইলিয়ম অদ্ভুত বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। ফ্রান্স দেশের দুইটা প্রদেশ আলসাস্ এবং লোরেণ জর্ম্মাণ কাড়িয়া লইলেন। প্রুষিয়-রাজ উইল-হেল্‌ম সমগ্র জর্ম্মণপ্রদেশের সম্রাট্‌পদে প্রতিষ্ঠাপিত হইলেন। একটা সম্রাজ্য লোপ পাইল বটে, কিন্তু নূতন করিয়া আর এক সাম্রাজ্য সমুদ্ভূত হইল। ফরাসীদেশে সাধারণতন্ত্র মতে রাজ্য শাসন হইতে লাগিল।

এই ঘোর রণের সময়ে মহারাণীর জ্যেষ্ঠকন্যা এবং রাজকুমারী আলিস্ জর্ম্মণিতে থাকিয়া আহত সেনাগণের বিশেষ শুশ্রূষা করিয়াছিলেন।

রাজকুমারী লুইসা এই বৎসরেই ডিউক অব আরগাইলের প্রথম পুত্র মাকুইস অব লর্ণকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। রাজা তৃতীয় জর্জ্জের সময় হইতে ব্যবস্থা ছিল যে, দেশের রাজার অননুমতিতে রাজবংশের কেহই প্রজাস্থানীয় কাহাকেও বিবাহ করিতে পারিবে না। কাজেই রাজ-কুমারী মহারাণীর অনুমতি লইলেন। মহারাণী সানন্দচিত্তে অনুমতি

দিয়াছিলেন। প্রজার সহিত ইংলণ্ডের রাজবংশের কাহারও বিবাহ এই প্রথম। ইহার পর আমাদের যুবরাজ প্রিন্স ওয়েল্‌সের প্রথমা কন্যার সহিত স্কটলণ্ডের ডিউক ফাইফের বিবাহ হইয়াছিল।

এই সময় হইতে আয়রলণ্ড প্রদেশে গোলযোগ আরম্ভ হইতে লাগিল। গৃহদাহ, নরহত্যা আদি ভীষণ অত্যাচার আইরীষগণ করিতে লাগিলেন। ক্লারকেনওয়েল জেলে অনেকগুলি ফিনিয়ান আবদ্ধ ছিল। এই কয়জন ফিনিয়ানকে মুক্ত করিবার জন্যে জন কয়েক আইরীষ ফিনিয়ান জেলের দেয়াল বারুদ দিয়া উড়াইয়া দিয়াছিল। এই পিশাচের কাণ্ডে চারি পাঁচজন নিরীহ ব্যক্তি অপঘাতে প্রাণত্যাগ করে। পরে গ্রেপ্তার হইল পাঁচজন আইরীষ এবং একজন স্ত্রীলোক। একজনের কেবল দোষ সাব্যস্ত হইল। তাহাকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলিতে হইল। এই গোলমালের পর হইতে আয়রলণ্ডের শাসন ব্যাপার দিন দিন কঠিন হইয়া উঠিতে লাগিল। মহামন্ত্রী গ্লাডষ্টোন আইন দ্বারা দোষ সংবরণ করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

১৮৭৫ সালে যুবরাজ প্রিন্স ওয়েল্‌স ভারত-ভ্রমণে আসিয়াছিলেন। ইহাঁর পূর্ব্বে ডিউক অব এডিনবরা ভারতে আসিয়াছিলেন। যখন যুবরাজ আইসেন, তখন লর্ড নর্থব্রুক ভারতের বড় লাট ছিলেন।

১৮৭৭ সালে মহারাণী ভারতের ঈশ্বরী বলিয়া নূতন উপাধি গ্রহণ করিলেন। আরবীভাষায় "কৈসর-ই-হিন্দ" উপাধি হইল। দিল্লির অদ্ভুত অপূর্ব্ব দরবারে বড় লাট লিটন ভারতবাসীগণকে লক্ষ্য করিয়া অনেক কথা বলিয়াছিলেন। এই বৎসরেই মাদ্রাজে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হয়।

দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

বাড়িতে একবার যম দেখা দিলে যেন সহজে আর ছাড়িতে চাহে না। মহারাণী বৎসরে বৎসরে এক একটী করিয়া নূতন শোক পাইতে লাগিলেন। ডিসেম্বর ১৮৭৮ সালে ভিক্টোরিয়ার বড় আদরের কন্যা আলিস্ ইহলোক ত্যাগ করিয়া গেলেন। ডার্ম্মাষ্টাড নগরে সেবার বড়ই ডিপ্তিরিয়া রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। রাজকুমারী ডিপ্তিরিয়ার বিষে দূষিত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে রোগে ধরিলে তিনি বুঝিলেন এইবার শেষ। তাই সঙ্গিনী মেরীকে বলিয়াছিলেন "মেরী, চারি সপ্তাহ পরে আমার বাবার মৃত্যুদিন আসিবে। আমিও চলিলাম।" সেই চারি সপ্তাহ বাঁচিয়া থাকিয়া ঠিক যে দিন আলবার্ট মরিয়াছিলেন, সেই দিন আলিসও সতের বৎসর পরে স্বর্গে চলিয়া গেলেন। আলিসের মৃত্যুতে ইংলণ্ডের প্রজা মাত্রেই দুঃখিত এবং ব্যথিত হইয়াছিল। সমগ্র য়ুরোপখণ্ড যেন শোকে বিচলিত হইয়াছিল। আলিস্ নিজের পবিত্র চরিত্রেরগুণে নিজের ঔদার্য্য গুণে, নিজের শুশ্রূষার বলে শত্রুমিত্র সকলকে আপনার করিয়াছিলেন। এমন কন্যার মৃত্যুতে মহারাণী একেবারে মরমে মরিয়া গেলেন।

এই বৎসরেই রুষ এবং তুর্কীতে ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়াছিল। পরিণামে রুষ জয়ী হইলেও এ মহারণে মুসলমান তুর্কী বিপুল বিক্রম দেখাইয়াছিল। রুষের চিরকালের এই বাসনা যে, দক্ষিণ য়ুরোপখণ্ডে সমুদ্রতীরে রণপোত রাখিবার জন্যে একটা উপযোগী বন্দর নিজের আয়ত্তে থাকে। কিন্তু রুষের ন্যায় অমিততেজা যদি সমুদ্রযুদ্ধে সুবিধা করিতে পারে, যদি সাগরপথের আগম-নিগম সহজে শাসনাধীন রাখে, তাহা হইলে পরে জগজ্জয়ী হইয়া পড়িবে। এই আশঙ্কায় য়ুরোপের অন্য রাজশক্তি সকল যথাবিধি রুষকে চাপিয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। রুষ চাহে, দক্ষিণ য়ুরোপের অপূর্ব্ব বন্দর, তুর্ক-সাম্রাজ্যের অতুল্য রাজনগরী কনষ্টান্‌টিনোপল। এই নগর লইতে হইলে তুর্কীকে

য়ুরোপ-ছাড়া করিতে হয়। তুর্কীকে য়ুরোপ-ছাড়া করিবার এক উপায় এই আছে যে, তুর্কী-রাজ্যের খৃষ্টান প্রজাগণকে খেপাইয়া দিয়া, অত্যাচারের ধুয়া তুলিয়া একটা ফ্যাসাদ বাধান।

১৮৭৭।৭৮ সালের প্রথমে বালকান প্রদেশের খৃষ্টান প্রজাগণ এইরূপে চাগিয়া উঠে। রুষ সুযোগ বুঝিয়া সৈন্য সামন্ত সাহায্যে প্রজাগণকে বিদ্রোহ-কার্য্যে উৎসাহ দিয়াছিল। তুর্ক-সম্রাট্ সকল সমাচার জানিয়া রুষের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধে তুর্কীগণ অদ্ভুত রণনৈপুণ্য দেখাইয়াছিল। তুর্ক-সেনাপতি ওসমানপাশা প্লেভনা-অবরোধকাণ্ডে যে প্রকার তেজ, বিক্রম এবং রণপাণ্ডিত্য দেখাইয়াছিলেন, ইদানী এক রুষ-সেনাপতি স্কবেলেফ ব্যতীত য়ুরোপখণ্ডে তেমন বাহাদুরী দেখাইতে আর কেহ পারে নাই। এমনও প্রবাদ যে, অন্যান্য তুর্ক-সেনাপতিগণ যদি রুষের কাছে উৎকোচ গ্রহণ না করিতেন, যদি ওসমান যথাসময়ে সাহায্য পাইতেন এবং যদি রুমানিয়ার বীর প্রিন্স চার্লস রুষকে সাহায্য না করিতেন, তাহা হইলে, রুষকে সে যুদ্ধে বোধ হয় হারিতে হইত। যাহা হউক সান-ষ্টিফানোর ক্ষেত্রে তুর্কীগণ রুষের কাছে সন্ধি প্রার্থনা করিয়া ঝগড়া মিটাইয়া দিল।

কিন্তু সান ষ্টিফানোর সন্ধিস্বত্ব দেখিয়া ইংরেজ বুঝিলেন যে, তুর্কীকে ষোল আনা রুষের আয়ত্তে থাকিতে হইবে। রুষ দেশ অধিকার না করিয়াও বিজেতার সকল সুবিধাটুকু ভোগ করিতে পাইবে। তখন ইংরেজের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন লর্ড বীকনসফীল্ড। ইনি চতুরতা এবং দৃঢ়তার সহিত কার্য্য করিয়া, তুর্ক-রাজ্যের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন। রুষকে ইংরেজের ভয়ে হটিয়া যাইতে হইয়াছিল। ইংরেজও রুষকে সংযত রাখিবার উদ্দেশে তুর্কের অধিকৃত সাইপ্রস দ্বীপ নিজের দখলে আনিলেন। ভারতে যাইবার পথ অনেকটা নিষ্কণ্টক হইয়া রহিল।

ইহার পরই ইংরেজকে পৃথিবীর নানাস্থানে ছোট ছোট যুদ্ধে বিব্রত থাকিতে হইয়াছিল। আফরিকার জুলু যুদ্ধ এবং ভারতে আফগান যুদ্ধ এই দুই

যুদ্ধই প্রধান। জুলুযুদ্ধে ফরাসী-সম্রাট্ নেপোলিয়নের পুত্র ইংরেজের পক্ষ হইতে রণ করিতে গিয়াছিলেন। তিনি হঠাৎ জুলুগণ কর্ত্তৃক হত হইয়াছিলেন। সম্রাট্ পত্নী ইউজিনীর এই এক পুত্র ছিল;—অন্ধের যষ্টি, নয়নের তারা বিদেশে অসভ্য বর্ব্বরের অস্ত্রে প্রাণ হারাইল শুনিয়া রাজ্ঞী শোকবিহ্বলা হইয়া পড়িয়াছিলেন। মহারাণীর এ শোক খুব লাগিয়াছিল—সকল পুত্রবতী রমণীই, কাহারও একপুত্রনাশের সমাচারে শুনিলে সহজেই ব্যাকুলা হইয়া পড়েন। আমাদের মহারাণী ত রাজ্ঞী ইউজিনীকে স্নেহ করিতেন এবং ভাল বাসিতেন; কাজেই তিনিও খুব ব্যথিতা হইয়াছিলেন। জুলুগণ অসভ্য হইলেও লড়াই করিতে খুব পটু; নির্ভীক নির্দ্দয় যোদ্ধা, নিজের প্রাণে মমতা নাই, পরের প্রাণের জন্যও মমতা হয় না। যাহা হউক পরে ইংরেজ সেনাপতিগণ জুলুগণকে যুদ্ধে হারাইয়া, জুলুরাজ সিটেওয়েকে বন্দী করিয়াছিলেন।

১৮৭৮।৭৯ সালে ভারতের সীমান্ত প্রদেশেও ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল। তখন ভারতের বড়লাট ছিলেন লর্ড লিটন। শের আলি কাবুলের আমীর রুষের সঙ্গে সৌহার্দ্দ্য স্থাপন করিয়া ইংরেজকে অবজ্ঞা করিবার যোগাড় করিয়াছিল। ভারতের মঙ্গলকামনা করিয়া ইংরেজ শের আলিকে নিরস্ত থাকিতে কহেন। উন্মত্ত আমীর ইংরেজের পরামর্শ গ্রাহ্য করে নাই। ফলে ইংরেজ আফগানে আমীর-বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। শের আলিকে যুদ্ধে হটিতে হইয়াছিল, তিনি প্রাণে মরিলেন। তাঁহার স্থানে সর্দ্দার য়াকুব খাঁকে আমীর-পদে অধিষ্ঠিত করা হইয়াছিল। সার লুই ক্যাভানারী ইংরেজ পক্ষে রাজদূত হইয়া কাবুলে গিয়া বাস করিয়া ছিলেন। পরে আফগানগণ বিশ্বাস-ঘাতকতা করিয়া সার লুইকে হত্যা করিয়াছিল। সেই ইংরেজহত্যার প্রতিশোধ লইতে সেনাপতি লর্ড রবার্টস যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। আফগান-যোদ্ধাগণকে ভীষণ যুদ্ধে পরাজিত করিয়া, য়াকুব খাঁকে বন্দী করিয়া ভারতে আনিয়া, তাঁহার স্থানে আমীর আবদর রহমান খাঁকে আফগানে আমীর করিয়া, তিনি ইংরেজ শক্তি ও তেজ অক্ষুণ্ণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু য়াকুব-ভ্রাতা আয়ুব

খাঁ মৈওয়ান্দ রণক্ষেত্রে একদল ইংরেজ সেনাকে পরাজিত করিয়া দিনকয়েকের জন্যে বিজেতার স্পর্দ্ধা করিয়া লইয়াছিলেন। সেনাপতি রবার্টস এ স্পর্দ্ধাও চূর্ণ করিয়াছিলেন।

ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

ফরাসীস্ বীর নেপোলিয়নের অধঃপতনের পর মিশর দেশের উপর ইংরেজের খুব তীব্র দৃষ্টি ছিল। মিশর ভারতের তোরণ-দ্বার স্বরূপ। মিশর আয়ত্তে থাকিলে য়ুরোপ হইতে কোন শক্তিই হঠাৎ আর ভারতে আসিতে পারিবে না। কিন্তু ফরাসীস্‌গণ মিশরে একরূপ পাকা আড্ডা গাড়িয়া বসিয়াছিল। সহজে মিশর যে ইংরেজের দখলে আসিবে, তাহা নহে। কিন্তু সুয়েজ খাল কাটিবার জন্যে ইংরেজ গবরর্ণমেণ্ট অনেক পয়সা দিয়াছিলেন; মিশর-শাসন জন্যে মিশরপতি খদেবকে অনেক টাকা দিয়াছিলেন। এখন এই সকল ঋণের টাকার সুদ ইংরেজ মহাজনগণ যথাসময়ে পাইতেছিলেন না। ইংরেজ রাজনীতিকগণ ব্যবস্থা করিলেন যে, ইংরেজ এবং ফরাসী উভয়ে মিলিয়া মিশরে শাসন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবেন; এবং নিজদের প্রাপ্য টাকার সুদ যথারীতি আদায় করিয়া লইবেন। ফলে মিশরে তিন প্রকারের ভিন্ন ভিন্ন রাজশক্তি শাসনকার্য্য চালাইতে লাগিল। ইংরেজ, ফরাসী এবং মুসলমান খদেব—এই তিন জনই দেশ শাসন করিতে লাগিলেন। অবশ্যই এমন গোলমালে নানাস্থানে নানা প্রকারের অত্যাচার হইতে লাগিল। একদল শিক্ষিত মিশরবাসী স্বদেশের স্বাধীনতার জন্যে চেষ্টা করিতে লাগিল। ইহাদেরই নেতা হইলেন আরাবী পাশা। আলেক্‌জাণ্ড্রিয়া নগরে একদিন হঠাৎ খুব মার দাঙ্গা হইল, অনেক য়ুরোপীয় মারা পড়িল। ইংরেজ রাজদূত আহত হইলেন। অগত্যা ইংরেজের রণতরী আলেক্‌জাণ্ড্রিয়া নগরকে ধ্বংস করিতে গোলাগুলি ছুড়িতে লাগিল, আলেক্-

জাজ্বিয়া ভস্মস্তূপে পরিণত হইল। সেনাপতি সার গার্নেট উল্‌সলী ইংরেজ সেনা ও ভারতের সেনা লইয়া মহারণে প্রবৃত্ত হইলেন। কাসাসিনের যুদ্ধে মিশরীগণকে পরাজিত করিলেন। কিন্তু আরাবীর দল একেবারে বিধ্বস্ত হইল না। সেনাপতি বুঝিলেন যে, একটা বড় লড়ায়ে হারাইতে না পারিলে ফল কিছুই হইবে না। আরাবী টেল-এল-কবীরে ছাউনি করিয়াছিল। গুপ্তভাবে ঘোরা তমিস্রা-নিশীথে সেনাপতি উল্‌সলী টেল-এল-কবীর আক্রমণ করিলেন এবং আরাবীকে পরাজিত করিয়া বন্দী করিলেন।

মিশরে ইংরেজের একরূপ ষোল আনা আধিপত্যই হইল। কিন্তু সুদনে মুসলমানগণ একজন মেহদী দ্বারা পরিচালিত হইয়া ইংরেজ-বিপক্ষে বিদ্রোহ করিয়াছিল। এই মেহদীর বিখ্যাত সেনাপতি ওসমান ডিগমা ইংরেজের অনেক সেনা মারিয়াছিল। বিখ্যাত ইংরেজবীর গর্ডন পাশা খার্তুমে হত হন। পরিশেষে সেনাপতি উল্‌স্‌লী মেহদীসেনা পরাজিত করিয়া ইংরেজ-আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

আয়রলণ্ডেও ইংরেজকে শাসন বিষয়ে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। আইরীষগণ ইংরেজের স্বজাতি হইলেও তাহারা রোমান কাথলিক ধর্ম্মাবলম্বী। তাহারা চাহে যে, আয়রলণ্ড আইরীষগণ কর্ত্তৃকই শাসিত হউক। যে সকল আইরীষ আয়রলণ্ড দ্বীপকে ইংরেজ-শাসন হইতে কথঞ্চিৎ স্বতন্ত্র রাখিতে উদ্যোগী তাহাদিগকে "ন্যাশানালিষ্ট" বলা হয়। এই ন্যাশানালিষ্টগণের মধ্যে অনেক নরঘাতক পিশাচ ছিল। ইহারা ডিনামাইট দ্বারা অনেক ঘর দুয়ার উড়াইয়া দিবার চেষ্টায় ছিল; এবং অনেক ক্ষতিও করিয়াছিল। পরন্তু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতি হইয়াছিল, যখন গুপ্ত ঘাতকে আইরীষ চীফ সেক্রেটরী লর্ড ফ্রেডরিক ক্যাভেণ্ডীষকে হত্যা করে। এই হত্যার পর আয়রলণ্ড প্রদেশকে খুব জবরদস্তির সহিত শাসন করা হইয়াছিল। কখনও ভয়ে, কখনও মিষ্ট ভর্ৎসনায় ইংরেজ আয়রলণ্ডকে সু-শাসনে রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন; এখনও কিন্তু আইরীষগণ শান্ত হইতে পারে নাই। আয়রলণ্ডের ব্যাপার

ইংরেজের কক্ষে যেন কণ্টকবৎ হইয়া রহিয়াছে। পরে পরে কত প্রধান মন্ত্রী আসিলেন এবং চলিয়া গেলেন, কেহই আয়রলণ্ডের কোন প্রকার সুব্যবস্থা করিতে পারিলেন না।

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

মহারাণী বিধবা হইয়া অবধি যে রাজকার্য্যে অবসর লইয়াছিলেন, তাহা নহে। তিনি যথারীতি রাজকার্য্য করিতেন, যথারীতি য়ূরোপের সম্রাট্গণকে পত্র লিখিতেন এবং নিজের মন্ত্রিদলের সহিত পরামর্শ করিতেন। কিন্তু মহারাণীর আমোদ আহ্লাদ উঠিয়া গিয়াছিল। বিধবা মহারাণী, রাজ্যেশ্বরী হইলেও সকল সুখে বঞ্চিতা থাকিয়া কেবল সৎকার্য্যে রত থাকিতেন। কোথায় কোন্ দুঃখিনী কোন্ কুটীরে রোগে কষ্ট পাইতেছে, মহারাণী শুনিতে পাইলে ছদ্মবেশে তথায় গিয়া হাজির হইতেন। দুঃখীর দুঃখকথা শুনিতে বড় ভাল বাসিতেন। দরিদ্রের দুঃখে দুঃখানুভব করিয়া দরিদ্রের সুখে সুখিনী হইয়া ইংলণ্ডেশ্বরী পরিতৃপ্তা থাকিতেন। লোকমুখে গল্পে অন্য রাজারাণীর দয়ার কথা শুনা যায় বটে, কিন্তু মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ন্যায় দয়ার এমন জাজ্জ্বল্যমাণ প্রমাণ ইদানী আর দেখা যায় নাই।

বিধবা গ্রাণ্ট একটী সামান্য কুটীরে বাস করিত। দশজনের দয়ায় তাহার আহারাচ্ছাদন চলিত। বৃদ্ধার একদিন হঠাৎ খুব জ্বর হইল, সাংঘাতিক জ্বর; ধিধবার ডাক পড়িয়াছিল, যাইবার দিন নিকট হইয়াছিল। মহারাণী এই কথা শুনিতে পাইয়া স্বয়ং প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় বৃদ্ধার নিকট যাইতেন, বাইবেল পাঠ করিয়া তাহাকে শুনাইতেন; রোগের সেবা করিতেন; এবং বুড়ীর অন্তিম সময়ে করযোড়ে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এমন দয়া, এত বিবেচনা কয়জন মহারাজা, মহারাণীর আছে?

একজন শিকারীর হঠাৎ একটা আঘাত লাগিয়া জীবন সঙ্কট হইয়া পড়ে। মহারাণী নিকটে ছিলেন, তিনি এই সমাচার পাইয়া স্বয়ং তাহার কুটীরে উপস্থিত

হইয়া যথারীতি শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। রাজবাটীর বড় বড় ডাক্তার আসিয়া দরিদ্র শিকারীর চিকিৎসা করিতে লাগিলেন, রাজকুমারীগণ একে একে পর্য্যায়-ক্রমে আসিয়া রোগীর সেবা করিতে লাগিলেন। ভগবানের কৃপায় রোগী বাঁচিয়া উঠিল; মহারাণী একমুখ হাসি হাসিয়া প্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন। মহারাণী যখন বালমোরালে থাকিতেন, এবং যখন ওসবর্ণে থাকিতেন তখন প্রত্যহ এমনি কত দরিদ্রের যে সাহায্য করিতেন তা। আর বলিয়া শেষ করা যায় না। এমন দয়াবতী রাণী হইয়াছেন বলিয়া তিনি ইংলণ্ডবাসীর ঈশ্বরী হইয়া পূজা পাইতেছেন। কিন্তু বিধির বাদ; এমন দেবীকেও রোগ শোকে ব্যথিতা হইতে হয়!

রাজকুমারী আলিসের মৃত্যুর পর মহারাণী একটা বড় শোক পাইলেন কনিষ্ঠ পুত্র লিওপোল্ড ডিউক-আলবানী ক্যানেজ নগরের হঠাৎ দেহ ত্যাগ করিলেন। প্রিন্স লিওপোল্ডের শরীর বাল্যকাল হইতেই ভাল ছিল না। রাজার ছেলে বলিয়া কোন মতে সাবধানে তাঁহাকে এতদিন বাঁচাইয়া রাখা হইয়াছিল। প্রথম যৌবনোদ্গমে লিওপোল্ডের দেহ যেন খুব ভাল হইয়া উঠিল। একেই দেখিতে কার্ত্তিকের মত ছিলেন, তাহার উপর যৌবন-প্রভায় রূপ যেন ফাটিয়া পড়িতে লাগিল। মহারাণী বিমুগ্ধা হইয়া ছোট ছেলের বিবাহ দিলেন। বধূটীও অতি সুন্দরী হইয়াছিলেন। বিবাহের পর লিও-পোল্ডের শরীর যেন আরও ভাল হইতে লাগিল। একটী মেয়ে হইল, বৎসরেক পরে আর একটী ছেলেও হইল। সকলেই ভাবিল, বিবাহ করিয়া চিররুগ্ন লিওপোল্ড সুস্থ সবলকায় হইল। কিন্তু এই সময়ে তাঁহার শরীর একটু খারাপ হইল। পরিবর্ত্তনের জন্যে ক্যানেজে চলিয়া গেলেন; তথায় হঠাৎ এক রাত্রে তাঁহার মৃত্যু হইল। মহারাণী তাঁহার নয়নমণি কনিষ্ঠ সন্তানের শোকে উন্মাদিনীবৎ হইয়া উঠিলেন। সেই সাবিত্রীসদৃশী সুরূপা ছোট বধূটীকে কোলে করিয়া নিশিদিন কেবল কাঁদিতেন। ইংলণ্ড [illegible] এ শোক দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া রহিল।

সবই সহিয়া যায়, পুত্রশোকও পাশরিতে হয়। উপযুক্ত পৌত্র প্রিন্স ভিক্টর রাজ্যাধিকারী—যুবরাজের জ্যেষ্ঠ পুত্র—ইহাঁর বিবাহ দিবার এইবার জোগাড় হইতে লাগিল। প্রিন্স ভারতে আসিয়াছিলেন, পৃথিবী পরিক্রমণ করিয়াছিলেন। সকল দেখিয়া সকল বুঝিয়া তিনিও বিলাতে গিয়া বসিয়াছিলেন। মহারাণী এইবার তাঁহার বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু নির্দ্দয় বিধি বাম হইলেন। বিবাহের পূর্ব্বেই সামান্য জ্বরে রাজকুমার, পিতা মাতা পিতামহীকে অকূল শোকসাগরে ভাসাইয়া ইহলোক ত্যাগ করিয়া গেলেন। উপযুক্ত পৌত্রের মৃত্যুতে মহারাণীর যেন সকল পুরাতন শোক উছলিয়া উঠিল। কিন্তু যে রাজকুমারীর সহিত বিবাহ-সম্বন্ধ হইয়াছিল, তিনি ত একেবারে যেন মরমে মরিয়া রহিলেন। মহারাণী কুমারীর ব্যথায় ব্যথিত হইয়া নিজের শোক ঝাড়িয়া, দ্বিতীয় পৌত্র ডিউক অব ইয়র্কের সহিত তাঁহার বিবাহ দিলেন। এত বড় বড় শোক চাপিয়া শেষে এক পৌত্রের বিবাহ দিয়া কথঞ্চিৎ সুখিনী হইয়াছিলেন। একবৎসরের পরই মহারাণীর এক প্রপৌত্র জন্মগ্রহণ করিল। মহারাণী সব ভুলিয়া প্রপৌত্র কোলে করিয়া বসিলেন।

মহারাণী সর্ব্বকনিষ্ঠা কন্যা বিয়েট্রিস্‌কে সদাই কাছে রাখিতেন। বিয়েট্রিসের বিবাহের বয়স হইলে, তিনি ঘরজামাই করিয়া রাখিবার মতন একটী ছোট জামাই খুঁজিতে লাগিলেন। প্রিন্স হেনরী অব ব্যাটেনবার্গ বিয়েট্রিসের রূপে মুগ্ধ হইয়া মহারাণীর কাছে ঘরজামাই হইয়া থাকিতে চাহিলেন। মহারাণীও প্রিন্স হেনরীকে ছোট জামাই করিলেন। বিয়েট্রিসের দুই একটী ছেলে-মেয়েও হইল। মহারাণী বৃদ্ধাবস্থায় এক প্রকার সুখেই ছিলেন। কিন্তু নির্দ্দয় যম ইহাতেও বাদ সাধিল। প্রিন্স হেনরী আশান্টী যুদ্ধে লড়াই করিতে গিয়াছিলেন, তথায় জ্বররোগে তাঁহার মৃত্যু হয়।

উপর্য্যুপরি এত শোকও কি মানুষে পায়? ভুবনেশ্বরী হইয়াও মহারাণী সামান্যার ন্যায় কত শোকই পাইলেন! বিধবা হইলেন, পুত্র হারাইলেন, পৌত্র হারাইলেন, জামাই গেল, মেয়ে গেল—একে একে অনেকে গেল।

মহারাণী ঈশ্বরে বিশ্বাসিনী, ভাগ্যের উপর নির্ভর করিতে জানেন, তাই এত শোকেও তিনি কখনও কর্ত্তব্যপথ হইতে স্খলিত হন নাই। ভগবান্ এম্। দেবীর মঙ্গলন করুন।

পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

১৮৮৭ সালে মহারাণীর প্রথম জুবিলী উৎসব হইয়াছিল। এই বৎসরে মহারাণীর রাজ্যকাল পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হইয়াছিল।

লণ্ডনে সে বৎসর খুব ধূম হইয়াছিল। সমগ্র ইংরেজ-সাম্রাজ্যে ২১শে জুন তারিখ আনন্দের দিন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। য়ূরোপের সকল রাজকুমার এবং যুবরাজ সেই উৎসবে আসিয়া যোগ দিয়াছিলেন। আমোদ আহ্লাদ, নাচ তামাসা আদি বিলাতের ঘরে ঘরে হইয়াছিল। কিন্তু শোক-তাপ-সন্তপ্ত মহারাণী প্রজাগণের সুখে সুখী হইয়াও প্রাণের বিষম বিষাদ-রেখা মুছিয়া ফেলিতে পারেন নাই। এত আমোদ আহ্লাদের দিনে তিনি উদাস-প্রাণে আকাশের দিকে তাকাইয়া কাঁদিতেছিলেন। এত আমোদের দিনে কোথায় স্বামী আলবার্ট, কোথায় পুত্রী আলিস্, কোথায় নন্দন লিওপোল্ড আর কোথায়ই বা পৌত্র ভিক্টর! আনন্দে শোকের মুখ যেন খুলিয়া দিয়াছিল। যে ঘোষণা-পত্রে মহারাণী প্রজাগণকে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন, তাহাতেও সেই শোকের ছায়া আসিয়া পড়িয়াছিল। সতী সকল দুঃখ পাশরিতে পারেন, পতিশোক কখন ভুলিতে পারেন না। এমন আনন্দের দিনেও সেই প্রাণের আলবার্টকে, সেই সুখ-দুঃখের ভাগী সহচর আলবার্টকে মনে পড়িয়াছিল। যেমন তেমন করিয়া মহারাণীর প্রথম জুবিলি কাটিয়া গেল।

১৮৮৮ সালে মহারাণীর বড় জামাতা, জর্ম্মণ সম্রাট্ ফ্রেডরিক ইহলোক ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। এমন জামাতার শোকে মহারাণী যে বিহ্বলা হইয়া-

ছিলেন, তাহা আর লিখিয়া বুঝাইবার নহে। বড়মেয়েও তাঁহার মত বিধবা হইল। মহারাণী চক্ষের জল সামলাইতে পারিলেন না।

এই সকল শোকে জর্জ্জরিত হইয়া তিনি ইংলণ্ড ত্যাগ করিয়া কিছু দিনের জন্যে য়ূরোপে গিয়া রহিলেন। কিছুদিন বিদেশে থাকিয়া তিনি বিলাতে ফিরিয়া আসিলেন। দেশে ফিরিয়া আসিয়া "ইম্পিরিয়াল ইনষ্টিটিউট" স্বর সাধারণের ব্যবহার জন্যে নিজে উপস্থিত থাকিয়া খুলিলেন। মহারাণীর কন্যা রাজকুমারী লুইসা মহারাণীর এক মর্ম্মর প্রস্তরের মূর্ত্তি স্বয়ং গঠন করিয়াছিলেন; সেই মূর্ত্তি কেন্‌সিংটন বাগানে রাখা হইল। রাজকুমারী হইয়াও লুইসা ভাস্কর কার্য্যে নিপুণা।

১৮৯৬ সালে আফরিকায় ট্রান্সভালে গোলমাল উঠিয়াছিল। ডাক্তার জেমিসন তাহাতে বন্দী হন এবং বিশেষ লজ্জিত হন। ইংরেজ রাজনীতিকগণের চাতুর্য্যে সকল বিপচ্ছায়া কাটিয়া গিয়াছে।

মহারাণীর হীরক-জুবিলিও এই বৎসর হইয়া গেল,—সুখে-দুঃখে, ভয়ে, আহ্লাদে, আতঙ্কে উত্তেজনায় হইয়া গেল। ভগবান করুন মহারাণী দীর্ঘ-জীবিনী হইয়া থাকুন।

অমাদের কার্য্যও শেষ হইল। আমরা মহারাণীর দেব-চরিত্রের দেবোপম কথা কহিয়া দশজনকে শুনাইলাম। ভালমন্দ ইহার নাই; এমন দেবীর জীবন-বৃত্তান্ত যেমন করিয়া হউক আবৃত্তি করিলে পুণ্য আছে—শুনিলে এবং পড়িলেওপুণ্য আছে।

মহারাণীর পুত্র, পুত্রবধূ, কন্যা ও জামাতা।

পরিচয়।

(১) মহারাণীর বড় মেয়ে—বর্ত্তমান জর্ম্মণ-সম্রাটের মাতা এবং জর্ম্মণ-সম্রাট্ তৃতীয় ফ্রেডরিক।

(২) যুবরাজ প্রিন্স অব্ওয়েলস্ এবং তাঁহার পত্নী।

(৩) মহারাণীর দ্বিতীয় পুত্র ডিউক অব্ এডিনবরা এবং তাঁহার পত্নী। ইহাঁরা এখন জর্ম্মণদেশের স্যেক্সকোবার্গ গথার ডিউক ও ডচেস।

(৪) প্রিন্সেস্ এলিস,—মহারাণীর দ্বিতীয়া কন্যা।

(৫) স্বয়ং মহারাণী ও রাজকুমার আলবার্ট।

(৬) মহারাণীর কনিষ্ঠ পুত্র রাজকুমার লিওপোল্ড।

(৭) মহারাণীর তৃতীয় কন্যা রাজকুমারী লুইসা এবং স্বামী মার্কুইস অব্ লর্ণ।

(৮) মহারাণীর তৃতীয় পুত্র ডিউক অব কনট এবং তাঁহার পত্নী।

(৯) মহারাণীর চতুর্থী কন্যা হেলেনা এবং স্বামী রাজকুমার ক্রিশ্চিয়ান।

(১০) মহারাণীর কনিষ্ঠা কন্যা বিয়েট্রিস এবং তাঁহার স্বামী ব্যাটেনবর্গের রাজকুমার হেনরী।

মহারাণীর দশ মন্ত্রী।

১। লর্ড মেলবোর্ণ।

জন্ম ১৭৭৯ ;—মৃত্যু ১৮৬৮ সালে।

মহামান্য উইলিয়ম ল্যাম্ব, লর্ড মেলবোর্ণ।

মহারাণী যখন রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন, তখন লর্ড মেলবোর্ণ প্রধান-মন্ত্রী ছিলেন। অষ্টাদশ বৎসরের সরলা বালিকা ইংলণ্ডেশ্বরী হইল ; লর্ড মেলবোর্ণ কুমারী রাজরাজেশ্বরীকে হাতে ধরিয়া শিক্ষা দিয়াছিলেন। স্নেহে পিতা, বাৎসল্যে ভ্রাতা, ঔৎসুক্য এবং উদ্যমে স্বামীর অধিক হইয়া লর্ড মেলবোর্ণ ভিক্টোরিয়াকে রাজনীতির গূঢ়তত্ত্ব সকল শিখাইয়াছিলেন। দিন রাত্রি অবিরাম, অবিশ্রান্ত-ভাবে, হাসি হাসি মুখে, মধুর ভাষায়, মধুময় করিয়া, রাজ্যের গূঢ় শাসন-ব্যাপারগুলি মহারাণীকে বুঝাইয়া দিতেন। ছায়ার ন্যায় তিনি মহারাণীর

অনুসরণ করিতেন। লর্ড মেলবোর্ণের ন্যায় শিক্ষক, লর্ড মেলবোর্ণের ন্যায় ভালবাসার মন্ত্রী না পাইলে বালিকা-মহারাণীর যে কি প্রকার মতি-গতি হইত, তাহা বলা যায় না। লর্ড মেলবোর্ণ মহারাণীকে শিখাইয়া, বুঝাইয়া, বিবাহ দিয়া, আত্মনির্ভরতা শিক্ষা দিয়া ১৮৪০ সালে বিদায় লইয়াছিলেন। কিন্তু সে বিদায় তাঁহার পক্ষে জন্মের বিদায় হইয়াছিল। সংসারে লর্ড মেলবোর্ণের ন্যায় ভাল বাসিবার, ভাল বাসাইবার কেহ ছিল না। স্ত্রী মুখরা, অসংযতা ছিলেন; পুত্র-কন্যাদি কেহ ছিল না, লর্ড মেলবোর্ণের জীবন স্নেহশূন্য বালুকাস্তূপের ন্যায় হইয়া ছিল। ভিক্টোরিয়ার ন্যায় বালিকাকে কন্যারূপে ভালবাসিতে, ভাল বাসাইতে পাইয়া লর্ড মেলবোর্ণ কৃতার্থ হইয়াছিলেন—আকাশের চাঁদ হাতে পাইয়াছিলেন। সেই চাঁদ যখন হাতের বাহির হইল, সেই চাঁদ যখন অন্যের মুকুটমণি হইল, তখন লর্ড মেলবোর্ণ দিশাহারা হইয়া নিজ অন্ধকার-জীবনের অন্ধতামসে ডুবিয়া গেলেন। ভিক্টোরিয়া মেলবোর্ণের এই অবসাদের সময়ে তাঁহাকে প্রফুল্ল করিতে বিশেষ যত্নবতী হইয়াছিলেন; কিন্তু চেষ্টা বিফল হইয়াছিল! মেলবোর্ণ মনভাঙ্গা হইয়াছিলেন, মেলবোর্ণের আশাব্রততী শুকাইয়াছিল; তাই তিনিও মাটীর দেহ মাটীতে মিশাইলেন। মহারাণীর বিচ্ছেদ মেলবোর্ণের অসহ্য হইয়াছিল—এত অসহ্য যে, তাহাতে জীবনপাত করিতে হয়। হতভাগার অন্ধের যষ্টি ভাঙ্গিয়া গেলে, সে ত পড়িয়াই মরিবে! ইংলণ্ডের প্রধান রাজমন্ত্রিগণের মধ্যে মেলবোর্ণ কবি ছিলেন, ভাবুক ছিলেন, রসজ্ঞ ছিলেন।

২। স্যর রবার্ট পীল।

জন্ম ১৭৮৮;—মৃত্যু ১৮৫০ সালে।

মহারাণীর দ্বিতীয় প্রধান-মন্ত্রী স্যর রবার্ট পীল। ইঁহাকে প্রধান মন্ত্রী করিতে মহারাণীকে অনেক ভাবিতে হইয়াছিল, বিশেষ মনোবেদনা পাইতে হইয়াছিল। প্রথমে মহারাণী ভাবিয়াছিলেন যে, স্যর রবার্ট তাঁহার মনোমত মন্ত্রী হইবেন না; একগুঁয়ে একরোখা লোক হইবেন। এই প্রকার ভাবিবার কারণও ছিল। মহারাণীর বিবাহের পর রাজসংসারে ব্যয়বৃদ্ধি হয়, তাই প্রজাবর্গের নিকট হইতে মহারাণী অধিক মাসহারা চাহিয়াছিলেন, স্যর রবার্ট মাসিক অত্যধিক টাকা দিতে আপত্তি করেন। যাহা হউক, প্রধান-মন্ত্রী-পদাভিষিক্ত হইয়া, কিছু দিনের মধ্যেই স্যর রবার্ট মহারাণীর এবং রাজকুমার আলবার্টের প্রিয়পাত্র এবং পরমমিত্র বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। স্যর রবার্ট

পীল রাজকুমার আলবার্টের রাজনীতির গুরু ছিলেন। ইংলণ্ডের ইতিহাস, ইংলণ্ডের সামাজিক এবং রাজনীতিক শৃঙ্খলা, ইংরেজের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি আদি বিষয়ক অনেক কথা তাঁহাকে বলিতেন; মহারাণীও এই সকল তত্ত্বকথা শুনিতেন। এই কারণে স্যর রবার্ট পীলের সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল; মহারাণী অত্যন্ত স্নেহ করিতেন এবং ভাল বাসিতেন। পীল সাহেবের ড্রেটনের আবাস-গৃহে মহারাণী স্বামীর সহিত গিয়াছিলেন; তথায় খুব নাচ-গান হইয়াছিল: এই নাচ-গান ব্যাপার লইয়া লোকে পীল সাহেবকে বেশ ঠাট্টা-তামাসা করিয়াছিল। যাহা হউক, মহারাণী পীলকে এত স্নেহ করিতেন যে, সদা সর্ব্বদা নিজের গাড়িতে পার্শ্বে বসাইয়া বেড়াইতে যাইতেন। পীল যদিচ স্থিতিশীল ছিলেন; কিন্তু কার্য্যে তিনি উন্নতিশীলের পদানুসরণ করিয়াছিলেন। ঘোড়া হইতে পড়িয়া গিয়া চোট খাইয়া পীলের মৃত্যু হয়। পীল মহামতি গ্লাড ষ্টোনের রাজনীতির গুরু ছিলেন।

৩। লর্ড এবার্ডীন।

জন্ম ১৭৮৪ ;—মৃত্যু ১৮৬০ সালে।

মহামান্য জর্জ্জ হামিণ্টন গর্ডন লর্ড এবার্ডীন।

বৃদ্ধ এবার্ডীন মহারাণীর শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। ইনি মনস্বী ছিলেন না, সদ্বক্তা ছিলেন না, তেজস্বী রাজ-পুরুষ ছিলেন না; কিন্তু সাধু, সরল, ধর্ম্মভীরু লোক ছিলেন। ইহাঁরই আমলে ক্রীমীয় যুদ্ধ হইয়াছিল। যদিচ সে যুদ্ধের উদ্যোক্তা ইনি ছিলেন না; কিন্তু যুদ্ধে ব্যবস্থা না হওয়াতে, রসদ-যোগান ব্যাপারে বিশৃঙ্খলা হওয়াতে ইহাঁর দুর্নাম হয়, ইনি পদচ্যুত হন। মহারাণী ইহাঁকে শ্রদ্ধেয় বন্ধু বলিয়া, বিশ্বাসী ভৃত্য বলিয়া জানিতেন।

৪। লর্ড রাসেল।

জন্ম ১৭৯২ ;—মৃত্যু ১৮৭৮ সালে।

মহামান্য জন রাসেল, বেডফোর্ডের ষষ্ঠ ডিউকের পুত্র।

লর্ড জন রাসেল বর্ত্তমান বিলাতী সাধারণ তন্ত্রের জনক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইনি রিফরম বিল পাশ করিয়া, মহাসভার সদস্য বাছাইয়ের নূতন ব্যবস্থা করিয়া সাধারণ লোকের শক্তিপ্রসার করিয়া দিয়াছেন। এই আইন অনুসারে ইংলণ্ডের মধ্যবিত্ত লোকের শক্তি-সামর্থ্য অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। লর্ড রাসেল উন্নতিশীল রাজনীতিক ; উদার, ধর্ম্মপরায়ণ এবং বহুজ্ঞ। লর্ড রাসেল সদ্বক্তা ছিলেন না, মিশুক ছিলেন না, রসিক ছিলেন না। সুতরাং রাজবাটীতে তাঁহার তেমন প্রসার-প্রতিপত্তি হয় নাই। প্রধান অমাত্য বলিয়া যে খাতিরটুকু দিতে হয়, যে টুকু আদর করিতে হয়, মহারাণী তাহাই করিতেন। লর্ড রাসেল দুইবার প্রধান অমাত্যের কার্য্য করিয়াছিলেন।

৫। লর্ড পামারষ্টন।

জন্ম ১৭৮৪ ;—মৃত্যু ১৭৬৫ সালে।

লর্ড পামারষ্টনের ন্যায় এত বড় সাহসী, তেজস্বী, স্পষ্টবক্তা মন্ত্রী ইদানী বোধ হয় ইংলণ্ডে আর হয় নাই। ইহাঁর পরে এক গ্লাডষ্টোন তেজস্বিতায় ইহাঁর সমকক্ষ। কথাবার্ত্তায় বড়ই অসাবধান, ঠাট্টা-তামসায় অসংযত, ধর্ম্মে কোমৎ-শিষ্য, পামারষ্টন মহারাণীর তেমন প্রিয়পাত্র ছিলেন না। তবে তেজস্বিতার গুণে তিনি সকলকেই বশে রাখিতে পারিতেন। তিনি বলিতেন যে, ইংরেজ পৃথিবীর যেখানেই থাকুক না কেন, ইংরেজ বলিয়া তাহার সম্মান থাকা উচিত। ব্যক্তিবিশেষ-ইংরেজের মর্য্যাদা-রক্ষা করিবার জন্য ইংরেজজাতি দায়ী—এই তাঁহার ধারণা; এবং এই ধারণা অনুযায়ী কার্য্য করিতেন। Civis Romanus Sum এই রোমক সূত্র তাঁহার মূলমন্ত্র ছিল। পামারষ্টনের ন্যায় তেজস্বী পররাষ্ট্রসচিব ইংলণ্ডে আর হয় নাই। তাঁহার তেজস্বিতার

জন্য একবার তাঁহাকে পররাষ্ট্রসচিবের পদত্যাগ করিতে হয়। তখন লর্ড রাসেল প্রধান-মন্ত্রী ছিলেন। এই উপলক্ষে পামারষ্টন এক দীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলেন; একদিনের প্রদোষ হইতে পর দিনের উষাকাল পর্য্যন্ত সেই বক্তৃতা চলিয়াছিল। সে কথার স্রোত দেখিয়া ইউরোপ চমকিত হইয়াছিল, ইংলণ্ড মুগ্ধ হইয়াছিল। পামারষ্টন যত দীর্ঘকাল ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রীর কার্য্য করিয়াছিলেন, ভিক্টোরিয়ার আমলে এত দীর্ঘকাল অন্য কেহ মন্ত্রিত্ব করেন নাই।

৬। লর্ড ডর্ব্বী।

জন্ম ১৭৯৯ সালে ;—মৃত্যু ১৮৭৯ সালে।

মহামান্য এডওয়ার্ড স্মিথ ষ্ট্যান্‌লী ডর্ব্বীর চতুর্দ্দশ আরল অথবা লর্ড। বাক্‌বিতণ্ডায়, শ্লেষ এবং ব্যঙ্গের ভাষায় গালি দিতে লর্ড ডর্ব্বী অদ্বিতীয়। তাঁহাকে The Rupert of debate বলা হইত। লর্ড ডর্ব্বীর ন্যায় পণ্ডিতও অল্প লোক।

লর্ড ডর্ব্বী খুব মিষ্টভাষী রসিক বক্তা ছিলেন। বক্তৃতায় ইহাঁর খুব নাম ছিল। মহারাণীর কাছে ইহাঁর তেমন প্রসার-প্রতিপত্তি হয় নাই। নামে ইনি প্রধান-মন্ত্রী ছিলেন, রাজকুমার আলবার্টই সকল কার্য্য করিতেন, সকল বিষয় দেখিতেন। কাজেই লর্ড ডর্ব্বীর তত ক্ষমতা ছিল না। মহারাণীও ইহাঁকে বন্ধুর পদে প্রতিষ্ঠিত করেন নাই। তবে প্রধান অমাত্য হইলে যে টুকু খ্যাতি-

প্রতিপত্তি থাকা দরকার, তাহা ইহাঁর ছিল। ইহাঁরই আমলে ভারতবর্ষ কোম্পানীর দখল হইতে মহারাণীর খাস শাসনাধীনে আনা হয়। কথিত আছে যে, ১৮৫৮ সালে মহারাণী যে অভয়বাণী ভারতে প্রচারিত করেন, তাহা ইহাঁরই লেখা। লর্ড ডর্ব্বী সুলেখক ও সুশিক্ষক ছিলেন। তবে বিশেষ পরিশ্রমী বা উদ্‌যোগী পুরুষ ছিলেন না।

৭। লর্ড বীকনস্ফীল্ড।

জন্ম ১৮০৫ ;—মৃত্যু ১৮৮১ সালে।

মহামান্য বেঞ্জামিন ডিসরেলী ; পরে লর্ড বীকনস্ফীল্ড। জাতিতে ইহুদী ছিলেন, ধর্ম্মে অবশ্যই খৃষ্টান। খৃষ্টান এবং ইহুদীতে অহি-নকুল সম্বন্ধ, কারণ কথা আছে যে, ইহুদীরা যীশুখৃষ্টকে ক্রুসে চড়াইয়া মারিয়াছিল। যাহা হউক, ইংরেজ খৃষ্টান শিক্ষার গুণে এবং উদারতার গুণে ইহুদীকেও বিশাল রাজ্যের প্রধান-মন্ত্রীপদে বরণ করিয়াছিলেন। ইহুদী-জাতীয় আরও একজন বিলাতের প্রধান রাজনীতিক বলিয়া বিখ্যাত। ইনি মিঃ গোসেন, বর্ত্তমান নৌ-সচিব। ডিস্‌রেলী সাহেব কথায় অদ্বিতীয় ছিলেন ; রকম-সহি উদ্ভট কথার সৃষ্টি করিতে, নূতন ভাঙ্গিতে শ্লেষ-ব্যঙ্গের বিকাশ করিতে ইহাঁর সমকক্ষ আর কেহ ছিল না। ডিস্‌রেলী সুপুরুষ ছিলেন, সাজসজ্জার পরিপাটী খুব ছিল ; লিখিবার শক্তি অসাধারণ ছিল। তবে তাঁহাকে তাঁহার দলের লোকই

ঘৃণা করিত; তিনি ইহুদী বলিয়া, তিনি বিদেশী বলিয়া ইংলণ্ডের বড় ঘরের বড় লোকে তাঁহাকে ঘৃণা করিত। স্বয়ং মহারাণীও প্রথমে প্রথমে ইহাঁর উপর বিশেষ বিরক্ত ছিলেন। ডিস্‌রেলী পুরুষ-প্রধান; উদ্যোগী, তেজস্বী, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ এবং কষ্টসহিষ্ণু—তাই সকল বাধাবিপত্তিকে পদদলিত করিয়া, সকলের ঈর্ষা-হিংসা-বিদ্বেষকে ফুৎকারে উড়াইয়া ইংলণ্ডের প্রধান ব্যক্তি হইয়াছিলেন। পদমর্য্যাদায়, সামাজিক সম্মানে, বিদেশে গৌরবে এবং সুযশে ডিস্‌রেলী এমন মান্য হইয়াছিলেন যে, বোধ হয়, ইহাঁর পূর্ব্বে এক মহাবীর ওয়েলিংটন ব্যতীত আর কোন ইংলণ্ডবাসীর এমন হইয়াছিল কিনা সন্দেহ। যেদিন প্রথমে ইনি মহাসভায় বক্তৃতা করিতে উঠেন, ইহাঁর অঙ্গভঙ্গি দেখিয়া সকলে বিদ্রূপের হাসি হাসিয়াছিল। উত্তরে ইনি বলিয়াছিলেন, "এখন হাসিতেছ—হাস, এমন দিন হইবে, যখন আমার কথা শুনিবার জন্য তোমরা উৎকর্ণ হইবে।" বাস্তবিক, পরে হইয়াছিলও তাই; ইহাঁর বচন-চটুলতা শুনিবার জন্য, ইহাঁর বিদ্রূপের বিক্রম দেখিবার জন্য লোক উন্মত্ত হইয়া উঠিত। যে মহারাণী ইহাঁকে উপেক্ষা করিতেন, সেই মহারাণীরই ইনি বার্দ্ধক্যের অবলম্বন ও সহায় হইয়াছিলেন; সেই মহারাণীই ইহাঁর হিউএণ্ডেন বাটীতে গিয়া ইহাঁকে সম্মানিত করিয়াছিলেন; ইহাঁর মৃত্যুর পর সেই মহারাণীই গির্জ্জা-ঘরে স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ মর্ম্মর-ফলকে লিখিয়া রাখিয়াছেন, "To the dear and honoured memory of Benjamin, Earl of Beaconsfield this memorial is placed by his grateful and affectionate Sovereign and friend' Victoria, R. I" সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী আর কখন কি এমন করিয়া প্রজার মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছেন? ডিস্‌রেলী স্ত্রীলোকের সেবা করিতে জানিতেন। ডিস্‌রেলী চটুল-চাটুবচনে স্ত্রী-প্রকৃতিকে মোলায়েম করিতে পারিতেন। কথিত আছে, 'He approached the queen with the supreme tact of a man of the world, than which no sort of flattery can be more effective and more dangerous" কিন্তু স্ত্রীজাতি-সেবক হইলেও, মহারাণীর

চাটুকার হইলেও, বীকন্‌স্ফীল্ড আসল কাজে ঠিক থাকিতে পারিতেন। তাঁহার বন্ধুগণ বলেন যে, "In trifles Disraeli never forgot the sex of the Sovereign In great affairs he never appeared to remember it "সামান্ত ব্যাপারে ডিস্‌রেলী মহারাণীকে খাতির করিতেন; কামিনী বলিয়া উপরোধ-অনুরোধ রক্ষা করিতেন; কিন্তু বড় বড় বিষয়ে, যাহাতে রাজ্যের শুভাশুভ নির্ভর-করিত—সেই সকল বিষয়ের বিচার-বিবেচনায় তিনি ভুলিয়া যাইতেন যে, স্ত্রীলোকের সহিত তিনি কথা কহিতেছেন। জাতির প্রকৃত মঙ্গলের প্রতি তাঁহার এত দৃষ্টি ছিল। লর্ড বীকন্‌স্ফীল্ড দুইবার প্রধান-মন্ত্রীর কার্য্য করিয়াছিলেন। ইনিই মহারাণীকে ১৮৭৭ সালে ভারতেশ্বরী উপাধি দিয়াছিলেন, ইনিই দিল্লীতে রাজসূয় ব্যাপার করিয়া ভারতের সকল দেশীয় রাজাকে করদ সামন্তের পদে নামাইয়াছিলেন। ইহাঁর চতুরতার প্রভাবে বিনাযুদ্ধে ইংরেজ সাইপ্রস দ্বীপ পাইয়াছেন, মিশর অধিকার করিয়াছেন।

৮। মিষ্টার গ্লাডষ্টোন।

জন্ম ২৯শে ডিসেম্বর ১৮০৯ সাল; এখনও জীবিত।

মহামান্য উইলিয়ম ইওয়ার্ট গ্লাডষ্টোন। বয়োবৃদ্ধ, জ্ঞানবৃদ্ধ গ্লাডষ্টোন ইংরেজের শিরোমণি। গ্লাডষ্টোনের ন্যায় অসাধারণ পণ্ডিত, অসাধারণ ধার্ম্মিক, অসাধারণ তেজস্বী এবং বিশ্বাসী, অসাধারণ বক্তা এবং লেখক, অসাধারণ কুশলী এবং মেধাবী ইংরেজ আছে বলিয়াই, ইংরেজ আজ জগতে অসাধারণ জাতি। লোক সাধারণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যে রাজমর্য্যাদা তুচ্ছ করিতে পারে, যে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ন্যায় স্বামিনীকে, আবশ্যক হইলে কখনও রূঢ় কথা বলিতেও সঙ্কুচিত হয় না, ধর্ম্মে যাহার অটল বিশ্বাস, বিলাসী ইংরেজ হইয়াও যে তপস্বীর ন্যায় সংযত,—উন্নত-চরিত্র এবং পবিত্র; এমন লোক যে জাতির নেতা হইবে, সে জাতি জগতে ধন্য এবং বরেণ্য হইবেই। জানুয়ারী ২৫শে তারিখে ১৮৩৩ সালে মহামতি গ্লাডষ্টোন ইংলণ্ডের

হাউস-অব-কমন্সের সদস্য মনোনীত হন। তদবধি ১৮৯৪ সাল পর্য্যন্ত প্রায় সাষট্টি বৎসর ইনি ইংলণ্ডের রাজনীতি-ক্ষেত্রে একজন প্রধান পুরুষ হইয়া বিচরণ করিয়াছেন। ইহাঁর জীবন-কথা বলিতে হইলে এই সাষট্টি বৎসরের ইংলণ্ডের ইতিহাস লিখিতে হয়। ইংরেজের বর্ত্তমান সাতন্ত্র্য ভাব, রাজনীতিক উন্নতি, বাণিজ্যের প্রসার—সকলই গ্লাডষ্টোনের অভিজ্ঞতা, শাসন-ব্যবস্থা এবং দূরদর্শনের ফল। মহারাণীর রাজ্যারম্ভের পূর্ব্ব হইতে গ্লাডষ্টোন রাজনীতিক-প্রধান। এখন সাতাশী বৎসরের অতিবৃদ্ধ হইয়াও তিনি ইংলণ্ডের শিরোভূষণ। গ্লাডষ্টোনের ন্যায় সুবক্তা ইংরেজ-জাতির মধ্যে এখন আর নাই। তাঁহার বক্তৃতার গল্প শুনিলে মনে হয়, যেন ইহাঁর বাকবিভূতি আছে। অশীতিপর বৃদ্ধ পার্লামেণ্ট-ঘরে দাঁড়াইয়া চারিঘণ্টাকাল অনর্গল, অনবরত বক্তৃতা করিয়াছেন; সে ভাষার মাধুরীই কত, সে বাক্যবিন্যাসই কেমন অদ্ভুত!—যে শুনিয়াছে, সেই যেন মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া বসিয়া আছে। অতি শুষ্ক হিসাব-নিকাশের ব্যাপারও, গ্লাডষ্টোন ভাষার গুণে, বলিবার যুক্তে সর্ব্বজন-মনোরঞ্জন করিতে পারিতেন। গ্রীক, লাটীন ভাষায়, খৃষ্টানী ধর্ম্ম-শাস্ত্রে গ্লাডষ্টোন অসাধারণ পণ্ডিত। গ্লাডষ্টোন প্রধান অমাত্য না হইলে, হয় ত কাণ্টারবরীর আর্চ্চবিশপ হইতেন। গ্লাডষ্টোন সর্ব্বদাই রাজমর্য্যাদাকে তুচ্ছ করিয়াছেন। এই কারণে গুজব উঠিয়াছে যে, তিনি আমাদের মহারাণীর সুনজরে কথনও পড়েন নাই। গ্লাডষ্টোনের ন্যায় তেজস্বী, ধীমান্ পুরুষ সেবক হইতে পারে না; সেবক-পদস্থ হইয়াও পরিচালক হইয়া দাঁড়ায়। গ্লাডষ্টোনের তেজ দেখিয়া মহারাণী বলিয়াছিলেন 'I am no longer Queen; Mr. Gladstone is King"—অর্থাৎ আমি আর ত রাণী নহি, মিঃ গ্লাডষ্টোনই রাজা! গ্লাডষ্টোন সাহেব এত বড় চরিত্রবান্ পুরুষ যে His friends lived in dread of his virtues." তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহার পবিত্রতার তেজে সদাই আশঙ্কিত থাকিতেন। মিঃ গ্লাডষ্টোন চারিবার ইংলণ্ডের প্রধান-মন্ত্রির কাজ করিয়াছেন। ইনি যত প্রকারের এবং যতদিন রাজকার্য্য

করিয়াছেন, এত প্রকারের এবং এতদিন কেহ উচ্চ রাজকার্য্যে ব্যাপৃত ছিল না। প্রথম বয়সে ইনি কনজরভেটিব ছিলেন, পরে ১৮৫১ সালে উন্নতি-শীলের দলে আসিয়া মিশেন। ইনিই আয়রলণ্ডকে স্বাতন্ত্র্য দিবার চেষ্টা করেন। যদিচ মহারাণী মিঃ গ্লাডষ্টোনকে তত খাতির করেন না, কিন্তু যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েল্‌স ইঁহাকে গুরুজ্ঞানে শ্রদ্ধা করিয়া থাকেন। অনেক বার মহারাণী গ্লাডষ্টোন সাহেবকে উচ্চ উপাধি দিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু সকল বারই তিনি রাজানুরোধ রক্ষা করেন নাই। গ্লাডষ্টোনের ন্যায় মহাপুরুষ ক্বচিৎ কখনও কোন দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে।

৯। লর্ড রোজবেরী।

জন্ম ১৮৪৭ সালে ; এখনও জীবিত।

মহামান্য আরচিবাল্ড ফিলিপ প্রিমরোজ আরল রোজেবেরী। মহারাণী যে কয়জন অদ্যাবধি প্রধান সচিব হইয়াছেন, লর্ড রোজবেরী বয়সে সর্ব্ব-কনিষ্ঠ; ঐশ্বর্য্যে এবং পদমর্য্যাদার বোধ হয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এমন সৌখীন অথচ পণ্ডিত, এমন ধীর অথচ উৎসাহী, এমন রসিক অথচ সুশীল, এমন তেজস্বী অথচ মিষ্টভাষী প্রধান অমাত্য ইংলণ্ডেশ্বরী পূর্ব্বে আর কেহ ছিল না। ইনি উন্নতিশীলদলের একজন প্রধান ব্যক্তি; মহামতি গ্লাডষ্টোনের মন্ত্রশিষ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পররাষ্ট্র-ব্যবহার বিষয়ে ইহাঁর অভিজ্ঞতা অসীম; এবং ইংলণ্ডের একজন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পররাষ্ট্র-সচিব। ধনকুবের ব্যারণ মেয়র রথচাইল্ডের একমাত্র কন্যা হ্যানকাক্ষে ইনি ১৮৭ বিবাহ করেন। গত ১৮৯০ সালে লর্ড রোজবেরীর পত্নীবিয়োগ হইয়াছে। সেই অবধি ইনি

অববাহিত আছেন। মধ্যে একবার গুজব উঠে যে, আমাদের যুবরাজ প্রিন্স-অব-ওয়েলসের কন্যা রাজকুমারী মডের সহিত ইহার বিবাহ হইবার কথা হইতেছে। কিন্তু এখন সে সব গুজব চাপা আছে। উন্নতিশীল রাজনীতিকগণের মধ্যে লর্ড রোজবেরী মহারাণীর সর্ব্বাপেক্ষা আদরের এবং স্নেহের সচিব। রাজসংসারে এত প্রতিপত্তি বোধ হয় আর কাহারও নাই। ইনি ১৮৯৪ সালে গ্লাডষ্টোন সাহেবের বিদায়ের পর ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রিপদে অভিষিক্ত হন। কিন্তু দুই বৎসরের মধ্যে পদত্যাগ করিতে হয়। যাহা হউক, লর্ড রোজবেরী ইংলণ্ডেশ্বরী সচিবগণের মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি।

১০। লর্ড সলস্‌বেরী।

জন্ম ১৮৩০ সালে; এখনও জীবিত।

মহামান্য রবার্ট আরথার ট্যালবট গাসকইন সিসিল, মার্কুইস অব সলস্‌বরী। মহারাণীর বর্ত্তমান প্রধানমন্ত্রী। ইংলণ্ডেররাণী এলিজাবেথের যে বিশ্বাসী সচিব সিসিল ছিলেন, তাঁহারই বংশাবতংস আমাদের বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী। লর্ড সলসবেরী ইহার পূর্ব্বে দুইবার প্রধান অমাত্যের কার্য্য করিয়াছিলেন; ৯ই জুন ১৮৮৫ সালে প্রথমে প্রধান মন্ত্রী হন; ১৮৮৬ সালের জুন মাসে আবার প্রধানমন্ত্রী হন; এখন এই তৃতীয়বারে প্রধান-মন্ত্রী পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। ১৮৫৭ সালে জর্জ্জিয়ানা ক্যারোলাইনকে ইনি বিবাহ

করেন। ইনি স্থিতিশীল বা কনজর-ভেটিবদলের নেতা। কনজর-ভেটিব-দলে ইহাঁর ন্যায় কুশলী, বৈদেশিক ব্যাপারে বিচক্ষণ আর কেহ নাই। লর্ড সলস্‌বরী আমাদের মহারাণীর বার্দ্ধক্যের অবলম্বন বলিয়া পরিচিত। এমন রাজভক্ত, সেবাতৎপর, মহারাণীর অনুগত মন্ত্রী আর নাই। মহারাণী ইহাঁকে এতই স্নেহ করেন যে, গত ১৮৮৭ সালের জুবিলির সময়ে ইহাঁর হ্যাটফিল্ডের বসত বাটীতে পদার্পণ করিয়া ইহাঁকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন। লর্ড সলসবরী এক জন বড় বৈজ্ঞানিক বলিয়া পরিচিত; তড়িৎ-বিজ্ঞানে পাণ্ডিত্যই ইহাঁর অধিক। লর্ড বীকনস্ফীল্ডের ন্যায় বিজ্ঞদন্তীর অধীনে ইনি অনেক দিন শিক্ষানবিশী করিয়া ছিলেন। ইহাঁর বক্তৃতার পাণ্ডিত্য আছে, কিন্তু রসিকতা নাই, শব্দমাধুর্য্য নাই। তবে বেশ স্পষ্টবক্তা এবং তেজস্বী পুরুষ। ইউরোপের রাজন্যবর্গের কাছে ইহাঁর বেশপ্র সার-প্রাতপত্তি ছিল।

শেষ কথা।

সেই একদিন—এই একদিন।

১৮৩৭ সালের ২০শে জুনের শেষরাত্রিতে অনাথিনী বালিকা ভিক্টোরিয়া পিতৃতুল্য সচিব মেলবোর্ণের স্কন্ধে ভর করিয়া অশ্রুপূর্ণ-লোচনে ইংলণ্ডের রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছিলেন;—সেই এক কেমন দিন! আর এই ষষ্টি বৎসর পরে, কত শোক-দুঃখ-বিরহ-বিচ্ছেদ সহ্য করিয়া, ভয়-ভাবনা-উৎকণ্ঠার উর্ম্মিমালা অতিক্রম করিয়া রাজরাজেশ্বরী ভিক্টোরিয়া বিধবা হইলেও জগৎপূজ্যা হইয়াছেন, শোকসন্তপ্তা হইলেও ত্রিভুবন-ধন্যা হইয়াছেন, ক্ষুদ্র ইংলণ্ডের রাণী হইলেও ত্রিলোকেশ্বরী হইয়াছেন, অশীতিপরা হইলেও জুবিলি-মহোল্লাসের ইষ্টদেবী হইয়াছেন;—আজ আবার এক দিন! সেই একদিন—আমরা কেমন ছিলাম, কি ছিলাম; আর এই একদিন আমরা কেমন হইলাম, কি সাজিলাম? সেই একদিন বিশাল ভারতবর্ষের কতটুকু ইংরেজ-করায়ত্ত হইয়াছিল! আর এই একদিন সসাগর ভারত-সাম্রাজ্যের কতটুকু এখনও সম্পূর্ণ ইংরেজ-আয়ত্তাধীন হয় নাই! এই সব স্বপ্নের ব্যাপার আবার স্মৃতির শিলায় পিষিয়া লইতে বাসনা হয়।

তখনকার ভারত।

যবে মহারাণী ইংলণ্ডের রাজাসন অধিকার করেন, তখন ভারতের অপূর্ব্ব চিত্র। কেবলমাত্র ভরতপুর লর্ড কম্বরমীয়রের কৌশলে ধূলিসাৎ হইয়াছিল;—পরে জাঠদিগেরও দর্পচূর্ণ হয়। অপরিণামদর্শী উদ্ধত বালাজি-বাজিরাও বিষণ্নমনে বিঠুরে বসিয়া, দত্তক শিশু নানাকে দুধকলা খাওয়াইতে-ছিলেন, স্বপ্নের ঘোরে পুনার পেশওয়েগিরির বাহাদুরী লইতেছিলেন। আর

তাহার বিশাল-রাজ্য বোম্বাই প্রদেশের উদর বৃদ্ধি করিয়াছিল। তাঁহার অংশৈক-মাত্র লইয়া পুরাতন সেতারা রাজ্য গঠন করিয়া ইংরেজ রাজনীতিক ভবিষ্যৎ ব্রণের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন। পঞ্জাবকেশরী মহাবীর রণজিৎসিংহ তখনও জীবিত ছিলেন, তখনও পেশাবরের কোল হইতে শতদ্রুর তীর পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতাপ অক্ষুণ্ণ ছিল। অন্য দিকে অক্টরলনী এবং জিলেসপাই সেনাপতিদ্বয়ের বাহুবলে নেপাল বিধ্বস্ত হইলেও, তখনও তেজস্বী ভীমসেন থাপা প্রধান মন্ত্রীর আসন অধিকার করিয়া অপ্রতিহততেজে নেপালরাজ্য শাসন করিতেছিলেন। বিবেচক নির্লোভ এবং ধীর বড় লাট লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্কও উর্ব্বরা অযোধ্যাভূমির প্রতি সেই সময়েই যেন লালসার দৃষ্টি করিয়া নবাব উজীর সাহেবকে ন্যায়ের শাসনে দেশ রক্ষা করিতে ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। এই কারণে রামপুর হইতে গোরক্ষপুর পর্য্যন্ত সকল দেশের লোকে বিচলিত হইয়াছিল। আবার গোয়ালীয়র-রাজের বিরাট সেনাসমাবেশ দেখিয়া—সে সেনার সুশিক্ষা দেখিয়া বড় লাট এলেনবরা ভীত এবং চিন্তিত হইয়াছিলেন। ইন্দোরে তখনও টুকাজী হোল্কার রাজগদি পান নাই, রাণীমহলের চক্রান্তে রাজকার্য্য এক প্রকার বন্ধ ছিল। মহীশূরে মহামন্ত্রী পূর্ণ মহারাজের নামে দেশ শাসন করিতেছিলেন। নাগপুরের ভোঁসলা রাজা অপুত্রক হইয়া পরলোক গমন করেন, সুপ্রসিদ্ধ সাহেব জেঙ্কিন্স হিন্দু রাজার নামে রাজ্য শাসন করিতেছিলেন। বাঙ্গালা দেশে ইংরেজের শাসনব্যবস্থা অপ্রতিহত ছিল। তবে ডাকাইতেরও প্রবল প্রতাপ ছিল। রামশরণ বাবু, আশাসনি, মেঘা আদি বড় বড় সর্দ্দার দেশ লুটপাট করিত। শ্লিম্যান সাহেব ঠগি ধরিবার জন্য রমণীসাজে বাহির হইয়াছিলেন। লসিংটন, প্লাউডেন, লাটুর আদি সাহেবের বিরাট বুদ্ধির ব্যবস্থার গুণে প্রজা জমিদার সকলেই অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। লর্ড ম্যাকলির ন্যায় অল্পদর্শী এবং তেজস্বী উচ্ছৃঙ্খল ইংরেজ লেখক রাজনগরের পিশাচদলের সহবৃত করিয়া তখন হইতেই হিন্দুজাতির জন্য ভাবার চোখা

চোখা ইতরতা বাছিয়া রাখিতেছিলেন। তখন ডাকঘর, ডাকপিয়ন ছিল না। মুসলমানী টপ্পা ছিল, দুই আনা হইতে আট আনা মাশুল দিলে কোম্পানীর কাসীদ চিঠি লইয়া যাইত। কলিকাতায় ঢাকা ড্রেণ ছিল না, গ্যাস ছিল না, কলের জল ছিল না। দূরে দূরে তেলের আলো পথের ঘন অন্ধকারকে যেন পরিস্ফুট করিত; আর গুণ্ডা বদমায়েসেরা হেদোর ধারে, বাদুড়বাগানের পাশে পথিক মারিয়া টাকা রোজগার করিত। অল্পবিস্তর রাজনীতির আন্দোলন ছিল, বক্তা রামগোপাল ঘোষের মুখে, রাজা রামমোহন রায়ের কলমের ডগে, এবং বাবু হরকুমার ঠাকুরের বৈঠকখানায়। দেশের লোকে বিলাতের রাজা-রাণী বড় জানিত না—চিনিত কেবল "জান কোম্পানী বাহাদুর"কে। তখন নীলের নূতন রেওয়াজ, নীলকরের তেজ প্রভাত-সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতেছিল। তখন সমাজ ছিল, বাঁধাবাঁধি ছিল, শাসন ছিল, ভয় ছিল। তখন এক টাকায় দুই মণ চাউল পাওয়া যাইত, দশ সের সর্ষপ তৈল বিকাইত, চারি সের ঘৃত পাওয়া যাইত।

শোণিতপাতের সূচনা।

পরন্তু এই ১৮৩৭ সালে এক মহা ব্যাপারের সূচনা হইয়াছিল। পরে এই জন্য ইংরেজকে ভয়ানক নরহত্যা, অগণিত অর্থব্যয়, ও বিষম অধর্ম্মাচরণ করিতে হয় এবং লোকলজ্জা সহিতে হয়। রুষিয়া ভারত আক্রমণ করিবে, এই ভয়ে ইংরেজ তখনকার ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া,—পঞ্জাব আফগানিস্থান আদি দেশ অতিক্রম করিয়া, হিরাট অধিকার করিতে চাহেন। তখন হিরাটের কামরাণ এবং তাহার মন্ত্রী ইয়ার মহম্মদ খাঁ শাসনকর্ত্তা; কাবুলে দোস্ত মহম্মদ খাঁ। এই দোস্ত মহম্মদই কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট হাউসে বাস করিয়া লর্ড অকল্যাণ্ডের ভগিনী মিস্ ঈডেনের সহিত কত সময়ে দাবা খেলিতেন;

হারিতেন, হারাইতেন। পারস্যরাজও হিরাট অধিকার করিতে চাহেন, হিরাট অবরোধ-হয়; এবং এই সূত্রে ইংরেজ যুবক এলফ্রেড পটিঞ্জরের অদ্ভুত বীরত্বের কথা জগৎ জুড়িয়া পড়ে। ইংরেজ পরে কাবুল জয় করেন, কাবুলে বাস করেন, নিজেদের ক্রীড়াকন্দুক সাহসুজাকে কাবুল-তক্তে বসাইয়া কিছুদিন বাহার দেখেন। পরন্তু নৃশংস আকবর খাঁর চক্রান্তে সদলবলে ইংরেজের সেনাপতি কাবুলেই নিহত হন; রক্তাক্ত-কলেবরে বাঁচিয়া আসিয়া জালালাবাদে এই ভীষণ সমাচার দেন, একমাত্র ইংরেজ ডাক্তার ব্রাইডন। শেষে কাবুলের স্পর্দ্ধা চূর্ণ করা হইয়াছিল; কাবুলের পাথরের বাজার উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল বটে। কিন্তু প্রায় চল্লিশ বৎসর পরে লর্ড লিটনের সময় আবার সেই কাবুলেই স্যর লুই ক্যাভানারী কাটা পড়েন, মইবন্দ রণক্ষেত্রে ইংরেজ পরাজিত হন। ইহারও প্রতিশোধ লওয়া হইয়াছে, তবে এই কাবুলী কাণ্ড মহারাণীর রাজ্যাধিকারের প্রথম দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত চলিতেছে। কবে এবং কিসে ইহার পরিসমাপ্তি—কে বলিতে পারে?

রমণীর প্রতাপ।

রাণী ভিক্টোরিয়ার অধিষ্ঠানের সময়ে ভারতবর্ষের বহু রাজ্যে অন্তঃপুর-চারিণী রাণীর প্রতাপ বাড়িয়াছিল। পঞ্জাবে রাণী ঝান্নাপান্না বা চান্দ কৌর, ঝান্সিতে রাণী লক্ষ্মীবাই, গোয়ালিয়রে বাইজাবাই ও তারাবাই, নেপালে বড় রাণী, ইন্দোরে হরিরাওয়ের মাতা এবং নাগপুরীতে আর এক রাণীর খুব বাহাদুরী বাড়িয়াছিল। স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী; সুতরাং কেবল স্ত্রীবুদ্ধি-পরিচালিত—দুষ্ট স্ত্রীলোকের শাসিত দেশে অচিরাৎ আপদ্ ঘটিল। পঞ্জাবে দুইবার শীখ সমর, গোয়ালিয়রে মহারাজপুর ও পন্নার যুদ্ধ, নেপালে আত্মদ্রোহ, নাগপুরীর বংশলোপ এবং সেতারা ও ঝান্সির সর্ব্বনাশ ঘটিল। ইন্দোরে

অনেক বিভ্রাটের পর তুকাজী-রাও হোল্কার রাজতিলক পাইলেন। গোয়া-লিয়রের বিজয়মালা-চতুরঙ্গিণী-সেনা সম্পূর্ণ নষ্ট করিয়া চতুর লর্ড এলেনবরা জয়জিরাও সিন্ধিয়াকে রাজগদী দিয়াছিলেন। আর "That Messalina of the Punjab রাণী চাঁদ সোণার দেশকে পদতলে চূর্ণ করিয়া, বিশ্বাসঘাতকের পাপ-নিশ্বাসে খাক্ করিয়া, বিক্রমকেশরী ইংরেজকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া, দেশের স্বাধীনতার হেমহার বিজেতার পদে জড়াইয়া দিয়া নেপালে পলাইয়া গেলেন। বীরপ্রসূ পঞ্জাব, রণজিতের বহুযত্নে পালিত পঞ্জাব, গুরু গোবিন্দের আদরের নিধি পঞ্জাব, পিশাচীর পাপে ধূলায় লুটাইল। খালসার বিক্রমগর্ব্ব মুদকী মুলতানের বালুকার মধ্যে লুকাইল। ইংরেজ পঞ্জাব লইলেন, সঙ্গে সঙ্গে বিষম চিন্তা, বিরাট ভাবনার ভারও মাথায় করিলেন। স্বর্ণ ঝারি ভারতকে কক্ষে করিয়া পথের ধারে দাঁড়াইয়া,—রুষের সম্মুখান হইয়া, কেবল অহরহ ভয়ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন।

সুখের স্বপ্ন

অযোধ্যা,—রামের অযোধ্যা, বিশ্বাসঘাতক বাদসাহী-উজীর সুজা-উদ্দোলার অযোধ্যা অন্যায়-শাসনে বিপর্য্যস্তপ্রায় জানিয়া ইংরেজ নিজের করায়ত্ত করিলেন। ওয়াজীদ আলি সাহেবের মর্ত্ত্যের নন্দন-কানন কাইসারবাগ হইতে, মচ্ছিভবন হইতে মুসলমান দূর করিয়া ইংরেজ গোরা তথায় বাস করিল;—বহু তালুকদারের কথা না শুনিয়া ইংরেজ অযোধ্যা অধিকার করিলেন, আর ভবিষ্যৎ ভীষণ বিদ্রোহের বীজ বপন করিয়া রাখিলেন। ১৮৩৭ হইতে ১৮৫০ পর্য্যন্ত এই কয় বৎসরে পঞ্জাব গেল, অযোধ্যা গেল, নাগপুর গেল, ঝান্সি গেল, সেতারা গেল, কেরৌলী গেল, সিন্ধুদেশ গেল, নবাবী কর্ণাট গেল, তাঞ্জোর গেল, নিজামের দক্ষিণবাহু বেরার গেল,—একে

একে দেশী রাজার কতই গেল। ইংরেজের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের সকল দেশীয় অন্তরায়গুলি উঠিয়া গেল ;—দেশীয় ধূসর বর্ণ মুছিয়া গিয়া "সব লাল হো গয়া"। ন্যায়বান্, জ্ঞানবান্, ধনবান্, ক্ষমতাবান্ ইংরেজ একচ্ছত্র ভারতেশ্বর হইলেন। বহুকালের বহু আঘাতে জর্জ্জরিত, বহুদুঃখে সম্পিণ্ডিত, বহুপ্রকারে বিহ্বলীকৃত ভারতবর্ষ আবার বুঝি বীরের অঙ্কে শান্তি পাইলেন ; বহুদিনের পর আবার বুঝি ধরিত্রী বীর-ভোগ্যা হইয়া ধীরা হইলেন। এক শক্তিতে গ্রথিত হইয়া, একভাবে ব্যবস্থিত হইয়া, এক স্বামীর অধীন হইয়া বিশাল ভারত-রাজ্য বুঝি নিশ্চিন্তের প্রাতঃস্নান করিল।

বিপদের কুয়াসা।

কিন্তু ভাগ্যের লেখা দুরপনেয়, অদৃষ্টের ইঙ্গিত অবশ্যসম্ভাব্য। যে শান্তি চায়, তাহার অশান্তি আইসে, যে ব্রণের মুখে প্রলেপ দেয়, তাহার অঙ্গে কোটী ব্রণ দেখা দেয়। ভারতের শরশয্যা ছিল, ইংরেজের কৃপায় গৃহসজ্জা হইল ; পরন্তু হতভাগার কপালে এ সোহাগ সহিল না। ১৮৫৭ সালের মে মাসে হিন্দু মুসলমান সিপাহীরা রাজবিদ্রোহী হইল। রাক্ষসের ন্যায় দিগ্‌বিদিগ্‌-জ্ঞানশূন্য হইয়া, অন্নদাতা,আশ্রয়দাতা ইংরেজের রক্তে ভারতভূমি অসুরঞ্জিত করিল। সেই বারাকপুর-কাণপুরের, দিল্লি-লক্ষ্ণৌয়ের, মীরট-মথুরার, পাটনা-আরার, আলাহাবাদ-বহরমপুরের, বিষম পৈশাচ ব্যাপারের উপর এখন কালের ঘন ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে, বিস্মৃতির স্থূল যবনিকা ঢাকিয়াছে ; আর তাহা উন্মোচন করিব না। এমন শুভদিনে শ্মশানের বিকট ভৈরব তাণ্ডবের কথা কহিব না, এমন মহামুহূর্ত্তে চিতাধূমে ফুৎকার দিয়া চক্ষু অশ্রুপূর্ণ করিব না। সে নানা সাহেব নাই, সে তান্তিয়া তোপী নাই, সে কুমার সিংহ নাই, সে বেণীমাধব নাই, সেই তেজস্বিনী লক্ষ্মীবাইও নাই ;—আর কেন, সে ব্যথার কথা, লজ্জার কথা, তুলিয়া রাজায় প্রজায় অপ্রস্তুত হই ! ইংরেজের সর্ব্বনাশী

প্রতিশোধ-প্রবৃত্তির বিষয় বলিয়া হাসির জ্যোৎস্নায় বিষাদের মলিন ছায়া আনি কেন? থাকুক সে পুরাতন কথা, হৃৎকন্দরে লুকান থাকুক,—মহাকালের শ্মশান-ভস্মে ঢাকা থাকুক!

ইংলণ্ডের রাণী ভারত-ঈশ্বরী।

১৮৫৮ সাল হইতে আর মহারাণী কেবল মাত্র ইংলণ্ডেশ্বরী নহেন, ভারতের রাজরাজেশ্বরীও হইলেন। আর শিখণ্ডীকে সম্মুখে রাখিয়া ভীষ্মসহ যুদ্ধ নহে;—"জন কোম্পানি"কে মাঝে রাখিয়া ভারতজয় আবশ্যক নাই। এখন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তিনি লোকপালিকা জগদ্ধাত্রী হইলেন। সিপাহীযুদ্ধ নিভিয়া গেল, কোম্পানির রাজও উড়িয়া গেল, ভারতের ভারতীয়ত্ব শুকাইয়া গেল। হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত, গান্ধার হইতে চীন পর্য্যন্ত ভিক্টোরিয়া একমাত্র অদ্বিতীয়া অধীশ্বরী হইয়া বসিলেন।

মহারাণীর রাজ্যকালে বিখ্যাত ঘটনা।

(১৮৩৭—৪১)

চার্টিষ্ট বিদ্রোহ, তাহাদের আবেদনপত্র রাউল্যাণ্ড হিল্ কর্তৃক ১০ পয়সার ডাকটিকিটের প্রচলন; তুর্কীর দুরবস্থা—রুসিয়া কর্তৃক আক্রমণ মহম্মদ আলির বিদ্রোহ; রণজিৎ সিংহের মৃত্যু।

(১৮৪১—১৮৪৬)

আফগান যুদ্ধ (প্রথম), ইংরেজের পরাজয়, আকবর খাঁর অত্যাচার, ইংরেজের কর্ত্তৃক আফগানের দর্পচূর্ণ; রিচার্ড কবডেন এবং জন্ ব্রাইট কর্তৃক "কর্ণ ল" আলোচনা; অবাধ বাণিজ্যের প্রসার বৃদ্ধি; আয়রল্যাণ্ডে ভীষণ দুর্ভিক্ষ।

(১৮৪৬—১৮৫৬)

য়ুরোপে প্রজাশক্তির বিকাশ; ফরাসীরাজ লুয়ি ফিলিপের পলায়ন; ফরাসী বিদ্রোহ; লুয়ি নেপোলিয়নের আধিপত্যবিস্তার, ইটালি, অষ্ট্রিয়া এবং এসিয়াতে পার্লেমেণ্ট ব্যবস্থা; নেপোলিয়নের ফরাসী-সাম্রাজ্য গ্রহণ; শিখযুদ্ধ; খাল্‌সা স্পর্দ্ধা চূর্ণ বিচূর্ণ, শিখস্বাধীনতা অস্তমিত, পঞ্জাব ইংরেজের প্রদেশ বলিয়া গৃহীত; ক্রীমিয়া যুদ্ধ, রুষ জার নিকলসের উপদ্রব; ইংলণ্ড এবং ফ্রান্স তুর্কীর সাহায্য উদ্‌যোগী। মিস্ নাইটিংগেলের অদ্ভুত সেবা।

(১৮৫৬—৫৮)

য়ুরোপে সাধারণ শান্তি; ভারতে ভীষণ সিপাহী-বিদ্রোহ; হ্যাভেলক্ আউটর‍্যাম্, ক্লাইড এবং রোজের অপূর্ব্ব বীরত্ব; ইংরেজের শাসনশক্তি ভারতে অক্ষুণ্ণ, মহারাণী ভারত শাসনে রাখিবার খাস ব্যবস্থা করিলেন।

(১৮৫৮—৬৭)

ইটালীর একতা; ম্যেজেণ্টা এবং সল্‌ফেরিনো যুদ্ধে অষ্ট্রেলিয়ার পরাজয়; গ্যারিবল্ডির দেশহিতৈষণা; ইংলণ্ড এবং ফ্রান্সে ব্যবসায়ে সন্ধি; আমেরিকার ভীষণ যুদ্ধ; সভ্য জাতি মধ্যে দাস ব্যবস্থার অপ্রচলন; কার্পাসের অভাব—ভারতে কার্পাস বাণিজ্যের বিস্তার।

(১৮৬৭—৮৭)

আয়রলণ্ডে বিপ্লব; ফিনিয়নদের উৎপাত; ইংলণ্ডে শিক্ষাপ্রচার; জর্ম্মণ ও ফরাসীর ভীষণ যুদ্ধ, ফরাসীর পরাজয়; রুষ তুর্কীর যুদ্ধ—তুর্কীর পরাজয়, বার্লিণের সন্ধি; তুর্করাজ্যের ভাগ বাটোয়ারা; জুলু বিপ্লব; মিশর যুদ্ধ, আসাণ্টি যুদ্ধ পার্লামেণ্টের শক্তি বিস্তার, ইংরেজ উপনিবেশের সহিত মাতৃভূমির ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, মহারাণীর প্রথম জুবিলী।

সম্পূর্ণ।

ভারতেশ্বরী-কল্যাণ-গানম্।

(১)

চিরমব রাজ্ঞীং
কুরু চিরজীবাং
ঈশ্বর হে।
কুরু জয়িনীং তাং
সুখচয়পূর্ণাং
চিরমবিতুং নঃ
ঈশ্বর হে।

(২)

(যুদ্ধেঽথবা শান্তৌ মহারাজ্ঞী-যোধবর্গ-কল্যাণার্থং গেয়ম্।)

অয়ি পরমাত্মন্
ক্ষিপ রিপুন্দস্যাঃ
পাতয় তং
সুখয় সুবীরান্
ভব চিরভক্তান্
অব বিনতান্ নঃ
ঈশ্বর হে।

(বিপ্লবে গেয়ম্।)

অয়ি পরমাত্মন
কির রিপুমস্যাঃ
পাতয় তং
বিপ্লবপক্ষং
জহি রিপুচক্রং
নিখিলবিভুস্ত্বং
ঈশ্বর হে।

(মারীভয়ে গেয়ম্।)

হর পরমাত্মন্
ত্বরিতমুপেতং
মারিভয়ম্
ব্যসনবিষণ্ণং
তারয় বিষয়ং
বিপদি গতিস্ত্বং
ঈশ্বর হে।

(২।৩)

যদিহ পরং তে
কির ধনমন্বে
ঈশ্বর হে।
নবকুলবৃন্দং
রময়তু রাজ্ঞীং
ভুবনসুগীতাং
ঈশ্বর হে।

(৩।৪)

অরিভয়হারী
চিরমসি তস্যাঃ
ঈশ্বর হে।
অবত সুরাস্তাং
ঘোষতু জনতা
চিরমব রাজ্ঞীং
ঈশ্বর হে।

(৫।৬)

অয়ি সুখসিন্ধো !
সকরুণনেত্র !
দীনসখ !
সসচিবপুত্রাং
ভারতমহিপাং
কুরু শুভযুক্তাং
ঈশ্বর হে।

(৪।৫)

অয়ি পরমাত্মন্
তব পদপদ্মে
কাময়তে
চিরমনুরক্তা
আর্য্যবসুন্ধরা
নতিনতশীর্ষা
ঈশ্বর হে।

শ্রী শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর

ভারতেশ্বরীর কল্যাণ-গান।

(১)

রাণীরে তার হে
চিরায়ু কর হে
ভো ভগবন্।
কর হে জয়িনী
মহিমাশালিনী
সবার পালিনী
ভো ভগবন্।

(২)

(যুদ্ধ বা শান্তি সময়ে মহারাণীর সৈন্যগণের কল্যাণার্থে গেয়।)

(বিপ্লবে গেয়।)

জগদীশ! উর,
অরি কর দূর,
বধিয়ে প্রাণ্।
রাজদ্রোহ শাস,
রিপুচক্র নাশ,
হে রাজরাজেশ!
শকতিমন্!

জগদীশ! উর,
অরি কর দূর,
বধিয়ে প্রাণ।
সুখী কর বীরে,
যুদ্ধে রাণীতরে;
আমা সবাকারে
কর হে ত্রাণ্।

(মারীভয়ে গেয়।)

জগদীশ! উর,
মহামারী হর,
বাঁচাও হে প্রাণ্।
দুখকর কর,—
নিবারণ কর;
স্মরি সকাতর
তোমার নাম।

(২।৩)

দেহ দয়া করি'
ভিক্টোরিয়া' পরি—
কুশলমান্।
নব নব মুখ
সুখিনী করুক ;
সকলে ঘুষুক
রাণীর নাম্।

(৩।৪)

এক্ষকের করে
বাঁচালে তাঁহারে
জীবনত্রা'ণ্।
দেবদূতগণ
করুন রক্ষণ ;
রক্ষ ভগবান্,
রাণীর প্রাণ।

(৫।৬)

হে সুখসাগর,
করুণা-আকর !
দীনপ্রাণ !
সুতামাত্য সহ
রাণীর করহ
মঙ্গল বিধান !
ভো ভগবন্।

(৪।৫)

তোমার চরণে
বঙ্গবাসিগণে
কৃপানিধান্
দৃঢ় অনুরাগে
এই ভিক্ষা মাগে
নমি ভূমিভাগে
ভো ভগবন্ !

শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর।